ই. এইচ. আই—৭
ইতিহাসের ঐচ্ছিক পাঠক্রম
পর্যায় ঃ ২৭

একক ১ □ শিল্প-বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের উদ্ভব

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ শিল্প-বিপ্লবের সংজ্ঞা

১.৩ শিল্প-বিপ্লবের সময়

১.৪ শিল্প-বিপ্লবের পটভূমিকা

১.৫ ইংল্যান্ডে কেন শিল্প-বিপ্লব আগে দেখা দিল?

১.৬ শিল্পায়নের দুই পর্ব

১.৭ শিল্প-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

১.৮ ইংল্যান্ড ভিন্ন অন্য দেশে শিল্প-বিপ্লব

১.৯ নতুন আবিষ্কার : কৃষিতে বিপ্লব

১.১০ নতুন আবিষ্কার : বস্ত্র-শিল্পে বিপ্লব

১.১১ নতুন আবিষ্কার : যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব

১.১২ শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল ও গুরুত্ব

১.১২.১ নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা

১.১২.২ নিঃস্ব মানুষের আবির্ভাব ও সমাজতন্ত্রের জন্ম

১.১২.৩ শিল্প-বিপ্লব কি সমাজ-পরিবর্তনে ছেদ এনেছিল?

১.১৩ সারাংশ

১.১৪ অনুশীলনী

১.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন

- শিল্প-বিপ্লব কাকে বলে, কবে এ বিপ্লব হয়েছিল, কেন হয়েছিল ও তার ফলাফল কী?
- মানব-সভ্যতায় এ বিপ্লবের স্থান কোথায়?
- কেন ইউরোপ বিগত কয়েকশ বছর ধরে পৃথিবীতে এত প্রাধান্য বিস্তার করেছে—তার শক্তির উৎস স্থল কী?
- কেন ইংল্যান্ড শিল্পায়িত আধুনিকতায় বিশ্বে প্রথম?
- কীভাবে শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল থেকে জন্ম নিল সমাজতন্ত্রের দর্শন।

১.১ প্রস্তাবনা

১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব মানুষকে শুনিয়েছিল তিনটি বাণী—স্বাধীনতা (Liberty), সৌভ্রাত্র (Fraternity) এবং সাম্যের (Equality) তিনটি বাণী—মানুষের সমাজ ও মনোবিপ্লবের তিনটি তড়িৎ উপাদান। একই সময়ে—এবং তার আগে ও পরে—ইংল্যান্ডে ঘটছিল আরেক পরিবর্তন। মানুষ—পদার্থ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত উদ্দীপনশক্তিকে (energy) একটি সমন্বয়ের মধ্যে এনে এমন সব ক্ষমতার উদ্ভাবন ঘটানো হচ্ছিল যার দ্বারা অনড়কে সচল করা যায়, মন্দ-গতিকে ঝড়ের বেগ দেওয়া যায় এবং স্থবিরকেও স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়। প্রযুক্তিতে বিজ্ঞানকে ব্যবহার (application of science to technology) করে আবিষ্কার করা হচ্ছিল নতুন যন্ত্র ও নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা। আসছিল যন্ত্রায়িত উৎপাদনের (mechanised production) যুগ। মানুষের ও পশুর পেশী শক্তির সীমা, বায়ু ও জলশক্তির অনিশ্চয়তা ইত্যাদি নিয়ে মানুষ অনেকদিন ধরে বিড়ম্বনা ভোগ করছিল। অতএব তার দরকার হচ্ছিল নতুন উত্তোলকের যার উত্তোলন ক্ষমতা বেশি। দরকার হচ্ছিল নতুন যন্ত্রের যার সঞ্চালন ক্ষমতা অধিক। দরকার হচ্ছিল নতুন জ্বালানি (fuel) ও উদ্দীপক শক্তির (energy) যার উচ্চতর তাপ প্রদানের ক্ষমতা বেশি। আর দরকার হচ্ছিল শক্ত ধাতব পাত যা চিরাচরিত কাঠের পাটাতনের থেকে বেশি মজবুত হতে পারে। এই সব প্রয়োজনগুলিকে মিটিয়েছিল ইংল্যান্ডের এবং পরে ইউরোপের অন্যান্য স্থানের ও আমেরিকার শিল্প-বিপ্লব। দীর্ঘকাল ইউরোপ ও পৃথিবী কৃষি-অর্থনীতির উপর নিজের সভ্যতাকে দাঁড় করিয়েছিল। এবার এই কৃষি—অর্থনীতির পাশে আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল আধুনিক অর্থনীতি—শিল্প অর্থনীতি—যার অনুষঙ্গে গড়ে উঠল নগরায়ণের ধারা, নগরবসতির নতুন বিন্যাস।

আসলে দেখা গেল সমাজ ও অর্থনীতির মধ্যে একসঙ্গে ছয় রকমের পরিবর্তন আসছে যে পরিবর্তনগুলি একটি আরেকটির দ্বারা তাড়িত ও প্রভাবিত—একটির সাথে আরেকটির অঙ্গ-সংযোগ (organic unity) রয়েছে। যেমন, (এক) কৃষিতে ভাঙন—কৃষিমানবের স্থানান্তর গমন—নতুন যন্ত্র প্রয়োগের দ্বারা কৃষিতে নতুন সংস্থান।

এর ফল হল কৃষির আড়ষ্টতা থেকে মনে, শরীরী উপস্থাপনায় ও জীবিকায় সতত চলমান থাকার নতুন ক্ষমতার আবির্ভাব। (দুই) নতুন যন্ত্রের আগমন—নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা—নতুন শিল্পপতি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব। এর সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করেছিল নতুন শ্রমিক শ্রেণী, সূচিত হয়েছিল নতুন শ্রমিক আন্দোলনের। এই (এক) আর (দুই) মিলে আনল নতুন পরিবর্তন যাকে বলা যেতে পারে উৎপাদনে নতুন সঞ্চার (new movement)। যন্ত্রের উৎপাদনই মূলত এর জন্যে দায়ী। (তিন) যন্ত্রের সাথে এল নতুন উত্তোলন, নতুন পরিবহন, নতুন সঞ্চারণ। মানুষ জয় করল পেশী শক্তির সীমা, জল ও বায়ু শক্তির অনিশ্চয়তা। (চার) যখনই মানুষ তার সীমাকে অতিক্রম করতে শিখল তখনই তার বন্ধন অসহিষ্ণু মনকে একটি শৃঙ্খলাবোধের মধ্যে রেখে এক নতুন লক্ষ্যে অভিনিবিষ্ট রাখার দরকার হল। এল নতুন জাতীয় অর্থনীতি (New National economy)। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যকে পরিশীলিত নীতির মধ্যে পরিচালিত করার দরকার হল। (তিন) ও (চার) ভাবনার জগতে আনল নতুন পরিবর্তন যাকে বলা যেতে পারে **নয়া নীতি** (New Policies)। (পাঁচ) নতুন উৎপাদন ও বিপণনের জন্য চাই বাজার। আরম্ভ হল বাজার খোঁজার জন্য দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা—নতুন সাম্রাজ্য, নতুন উপনিবেশ দখল করার বিশ্বময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। (ছয়) তার সাথে তাল রেখে শুরু হল ব্যাপকভাবে জাতি সম্প্রসারণ (race-expansion)। অর্থাৎ (পাঁচ) ও (ছয়) মিলে দ্বার খুলে দিল এক নতুন পরিবর্তনের যাকে বলা যেতে পারে অভিনব পরস্পর-নির্ভরতা (New interdependence)।

এই প্রারম্ভিক কথাগুলি যদি অনুসরণ করেন তবে আপনাদের শিল্প-বিপ্লব বোঝা সহজ হবে।

আসুন আমরা এবার শিল্প-বিপ্লবের গভীরতর পাঠের দিকে যাই।

১.২ শিল্প-বিপ্লবের সংজ্ঞা

শিল্প-বিপ্লব বলতে বোঝায় একটি দ্রুত পরিবর্তনের ধারা যার দ্বারা হস্তনির্মাণ ব্যবস্থার (handicraft) থেকে উত্তরণ ঘটল যন্ত্র-নির্মাণ ব্যবস্থায় (machine manufacture), কুটির শিল্প (Cottage industry) থেকে উদ্যোগ প্রসারিত হল বড় কারখানা শিল্পে (factory system) এবং শিল্পের চালিকা শক্তি হিসাবে পেশী-শক্তির (muscle power) বিকল্পে দেখা দিল প্রথমে বাষ্প-শক্তি (steam power) এবং পরে বিদ্যুৎ-শক্তি (Electrical power)। এর ফলে কৃষিব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তন হল এবং অর্থনীতি যা একসময়ে কৃষিনির্ভর ছিল তা শিল্প-নির্ভর হয়ে পড়ল। নগরায়ণ ত্বরান্বিত হল, নগরে কারখানা-কেন্দ্রিক (factory-centric) নতুন জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠল আর তার সাথে তাল মিলিয়ে অসংখ্য নারী-পুরুষ শহুরে কারখানাগুলির চারপাশে সারিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে বস্তির মধ্যে বসতি স্থাপন করল। আত্মপ্রকাশ করল নিম্নগামী জীবনে নিমজ্জমান সর্বহারার দল—প্রলেটারিয়েট—যাদের মুখোমুখি কলকারখানার মালিক পুঁজিপতিরা ক্রমবর্ধমান মুনাফা অর্জনের মধ্য দিয়ে স্ফীত হতে লাগল। এর সাথে বেড়েছিল যোগাযোগ—কৃষির সাথে শিল্পের দেয়ানেয়া—আর অধিক পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে বেড়েছিল বাণিজ্য। বাণিজ্যের সঙ্গে বাড়ল বাজার খোঁজার তাগিদ—সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ গঠনের নেশা। দেখা দিল ডাক-তার-রেল ব্যবস্থা। সমাজে প্রকট হয়ে উঠল শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব। মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বকে বুকে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল সমাজ-পরিবর্তনের দাবি। এক মরিয়া-সমাজের পরিবর্তনকামিতা থেকে জন্ম নিল সমাজতন্ত্রের দর্শন।

১.৩ শিল্প-বিপ্লবের সময়

শিল্প-বিপ্লব সম্বন্ধে প্রথম দৃষ্টিগোচর করার চেষ্টা করেন প্রথম দিকের ফরাসী লেখকরা। কিন্তু যিনি প্রথম 'শিল্প-বিপ্লব'—'Industrial Revolution'—শব্দ দুটি একটি অতিদ্রুত বিশেষ অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচকরূপে বর্ণনা করেছিলেন তিনি হলেন ঐতিহাসিক **আরনল্ড টয়েনবি** (Arnold Toynbee : 1852-83)। তিনি ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিস্ময়কর গতিকে বোঝানোর জন্য এই অভিধাটি ব্যবহার করেন। এরিক হব্সবম (E. J. Hobsbawm) লিখেছেন যে অনেকদিন ধরেই ইংল্যান্ডে শিল্পোন্নতি-জনিত অর্থনৈতিক প্রসার চলছিল। ১৮২০-র দশকের আগে ফরাসী ও ইংরাজ সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীরা এ ঘটনার সম্যক চরিত্রটি বুঝতে পারেননি এবং ১৮৩০-এর দশকের আগে, আরও শানিত করে বললে ১৮৪০-এর দশকের আগে—বিরাট কোন শিল্প পরিবর্তনের প্রভাব ইংল্যান্ডের বাইরে ইউরোপীয় মহাদেশে বা তার বাইরে বৃহত্তর পৃথিবীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। মোটামুটিভাবে ফরাসী দেশে রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা ও প্রভাবকে মাথায় রেখে সমকালীন আরেকটি দ্রুত অলক্ষ্যচারী পরিবর্তনকে বোঝানোর জন্য বিপ্লব শব্দটি বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায় আসা-যাওয়া করছিল। অবশেষে আরনল্ড টয়েনবির (Arnold Toynbee) আলোচনার সূত্র ধরে এই অভিধাটি সার্বিক ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করে। তবে শিল্প-বিপ্লবের কবে শুরু এবং কবে শেষ এ নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন ঐক্যমত ঐতিহাসিকদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। জনৈক জার্মান অর্থনীতিবিদ **অধ্যাপক হফ্ম্যান** (Professor W. Hoffman) ইংল্যান্ডের শিল্পোন্নতির পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে বলেছেন যে বার্ষিক শতাংশ হারে ('annual percentage rate') ১৭৮০ সালে ইংল্যান্ডের একক উন্নয়ন সর্বপ্রথম দুই-এর বেশি হল অর্থাৎ সমহারে উন্নয়নের দ্বিগুণ হল এবং এই মাত্রায় তা স্থির ছিল প্রায় শতাব্দীকাল। এই পরিসংখ্যান তত্ত্বকে মাথায় রেখে বিখ্যাত ঐতিহাসিক **ফিলিস ডিন** (Phyllis Deane) লিখলেন 'তাহলে আধুনিক প্রথা হচ্ছে প্রথম শিল্প-বিপ্লবের ১৭৮০-র দশকে সূচিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া কারণ সেই সময় থেকে ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ঊর্ধ্বগতি দেখা যায়' ('The current convention then is to date the first industrial revolution from the 1780's when the statistics of British international trade show a significant upward movement')। এই ধরনের উন্নয়নের কথা ভেবেই **অধ্যাপক রস্টো** (Professor W. Rostow) বলেছেন যে ইংল্যান্ডে নিশ্চিত শিল্পোন্নতির অধ্যায়টি ছিল ১৭৮৩ থেকে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ যে সময়কে তিনি বলেছেন 'আধুনিক সমাজগুলির জীবনে বড় জল-বিভাজিকা' (the great watershed in the life of modern Societies')। এই সময়ের মধ্যেই সুনিশ্চিত নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের উত্তর ('take off into sustained growth') হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। অধ্যাপক রস্টোর বিপরীত কোটিতে দাঁড়িয়েছিলেন **অধ্যাপক নেফ** (Professor Nef)। তাঁর মতে রানি প্রথম এলিজাবেথের সময়ে যে ধনতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থা গড়ে উঠছিল তার মধ্যেই লুকিয়েছিল শিল্প-বিপ্লবের ভ্রূণ। এইভাবে অধ্যাপক নেফ সূচনার প্রান্তসীমাকে কয়েক শতাব্দী পেছনে ঠেলে দিলেন আর অধ্যাপক রস্টো তাকে সঙ্কুচিত করে দিলেন নাটকীয় বিকাশের কয়েক দশকের মধ্যে। মোটামুটিভাবে আমরা আমাদের আলোচনায় এসব কথা মাথায় রেখেও অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকেই আমাদের আলোচনার কাল ধরে নেব।

১.৪ শিল্প-বিপ্লবের পটভূমিকা

শিল্প-বিপ্লবের একটি নিশ্চিত পটভূমিকা ছিল। এই পটভূমিকার আদিসীমা ষোড়শ শতাব্দী। ঐতিহাসিক এল. সি. এ. নোলস্ (L.C.A. Knowles) লিখেছেন যে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মৌলিকত্ব ও দ্রুততার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উনিশ শতকের সঙ্গে তুলনা করা চলে শুধুমাত্র ষোড়শ শতাব্দীর। এই শেষোক্ত শতাব্দীতেই প্রথম সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক আবিষ্কারের ফলাফল বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে। ভারতবর্ষ ও দুই আমেরিকার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হওয়ার সাফল্যের সাথে আত্মপ্রকাশ করল নতুন বাণিজ্যের উদ্ভাবন, নতুন সমুদ্রযাত্রী নাবিকের হাত ধরে এল নতুন বণিক, নতুন উপনিবেশ গড়ার স্বপ্ন, নতুন দুনিয়ার ধন—সোনারূপা, ফসল ও মানবশক্তিকে লুঠ করে নেওয়ার বেপরোয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জাতিতে-জাতিতে লড়াই, নবলব্ধ পুঁজির ঘনীভবন আর তার প্রভাবে শিল্পোদ্যোগের নয়া প্রচেষ্টা। ইউরোপ যুক্ত হল বিশ্বের সঙ্গে, বিশ্ব উন্মুক্ত হল ইউরোপের কাছে। এদিকে মহাদেশের ভেতরে হাজার বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান সামন্ততন্ত্র জীর্ণ হতে শুরু করল। সার্ফ ব্যবস্থা ভেঙে যেতে লাগল। গ্রামাঞ্চলের মানবশক্তি-চুয়ে চুয়ে শহরে আসতে লাগল। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইউরোপের সবদেশের প্রতিক্রিয়া এক ছিল না। পর্তুগাল ও স্পেন প্রথম পর্বের দুই সামুদ্রিক শক্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল নয়া দুনিয়ার সম্পদ। পর্তুগাল পূর্বদিকের সাম্রাজ্য আর মূল্যবান মশলা-বাণিজ্য থেকে আহৃত সম্পদ নিয়ে তৃপ্ত রইল। স্পেন মগ্ন রইল তার নববিশ্ব (New world) এবং দক্ষিণ আমেরিকার রৌপ্য খনিগুলি নিয়ে। প্রথম পর্বের এই দুই ক্যাথলিক শক্তি তাদের আহৃত সম্পদকে যতখানি ভোগের মধ্যে অপচয়িত করেছিল ততখানি অভ্যন্তরীণ উদ্ভাবনশীল সংগঠনের কাজে ব্যবহার করতে পারেনি। অচিরেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিল দুটি প্রটেস্ট্যান্ট রাজ্য—ইংল্যান্ড ও হল্যান্ড। এই দুই রাজ্য পূর্বতন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সামুদ্রিক আধিপত্য ভেঙে দিল। উত্তর আমেরিকায় ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করল নিজের উপনিবেশ। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন ও পর্তুগাল বিশ্বসম্পদকে হাজির করেছিল ইউরোপের দরজায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে সেই কাজ করল হল্যান্ড। এই শতাব্দীতে বিশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠল আমস্টারডাম (Amsterdam)। ঐতিহাসিকের ভাষায়—"Amsterdam was the exchange place of Europe"। এইবার ওলন্দাজদের অনুকরণ করতে লাগল ইংরাজরা। আঠারো শতকে তারাই হয়ে উঠল প্রধান।

দুটি কথা এখানে লক্ষণীয়। এক, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্য একটি বড় শক্তি হলেও সামুদ্রিক বাণিজ্যে এবং বিশ্বসম্পদ ভাগ-বাটোয়ারার ক্ষেত্রে কোন সুবিধা করতে পারেনি। আঠারো শতকে ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তার অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় কাঠামো ইংল্যান্ডের মতো সবল ছিল না। ফলে বিশ্বসাম্রাজ্যের প্রতিযোগী হিসাবে ফ্রান্স ছিল ইংল্যান্ডের দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে শিল্প-বিপ্লবের উদ্‌যাপনের মুহূর্তের ছবিটি তাই হয়ে উঠেছিল খুব সরল। সনাতন দুই বাণিজ্যিক শক্তি স্পেন ও পর্তুগালের বিশ্বসম্পদকে ভাগ করে নেওয়ার আর কোন ক্ষমতা ছিল না। দক্ষিণ আমেরিকার রৌপ্যখনি নিঃশেষিত হয়েছিল। পূর্ব দিকে মশলাবাণিজ্যও আর অত্যাশ্চর্য মুনাফার জন্ম দিতে পারছিল না। ওলন্দাজরা সপ্তদশ শতাব্দীর উদ্দীপনাকে

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারেনি। ফ্রান্স সারা আঠারো শতক ধরে রাষ্ট্রিক ব্যর্থতার ক্ষয়ে যাচ্ছিল এবং অবশেষে এক মহাদেশ কাঁপানো বিপ্লবের মধ্যে তার ব্যর্থ অস্তিত্বের গ্লানিকে মুছে দেবার চেষ্টা করল। শুধু ইংল্যান্ডই ছিল সজাগ টানটান একটি দেশ যে তরুণ সাম্রাজ্যবাদী উদ্দীপনায় বিশ্বের রসদ ভাণ্ডারকে উজাড় করে আনতে পারত। ফলে স্বাভাবিক নিয়মে ইংল্যান্ডই হল শিল্প-বিপ্লবের অগ্রণী দেশ। এ কথার অর্থ এই নয় যে, যে—দেশ বাণিজ্যিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছিল সেই দেশই শিল্প-বিপ্লব ঘটানোর গরিমা অর্জন করেছিল। শিল্প-বিপ্লব একটি দেশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া মাত্র, সে দেশের সমাজ-সংগঠন, মানবমন ও অর্থনীতির মধ্যে পুঁজিশ্রম ও সংগঠনের প্রকৃষ্ট স্থিতিস্থাপকতা ও পারস্পরিক সংশ্লেষ এবং দেওয়া-নেওয়ার ভারসাম্যের উপর তা নির্ভর করে। বিশ্ববাণিজ্য একটি দেশকে দেয় কাঁচামালের সংস্থান, বাজার, শ্রমের যোগান ও পুঁজি আর দেয় তার নিজের সমাজের মানুষদের এক বড় কর্মক্ষেত্র, অর্থবিনিয়োগের সুবিধা। ইংল্যান্ড তার অভ্যন্তরীণ সংস্থান আর বহির্বাণিজ্যের মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিল। তাই ইংল্যান্ডেই শিল্প-বিপ্লব সবচেয়ে আগে দেখা দেয়।

১.৫ ইংল্যান্ডে কেন শিল্প-বিপ্লব আগে দেখা দিল?

এটি আপাতভাবে ইতিহাসের একটি বিস্ময় যে ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্প-বিপ্লব হল, ফ্রান্সে হল না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ছিল একটি শিল্পোন্নত দেশ। তার জনসংখ্যাও ছিল বিপুল। উত্তর আমেরিকায় তার উপনিবেশও ছিল কানাডা থেকে লুইসিয়ানা (Louisiana) পর্যন্ত বিস্তৃত। আঠারো শতকে ভারতবর্ষে ও পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (West Indies) ফ্রান্সের অগ্রগতিও খারাপ ছিল না। দেশে জনসংখ্যা বেশি থাকায় দেশের শিল্প দেশের ভেতরেই তার বাজারকে খুঁজে পেয়েছিল। তাছাড়া পুঁজির অভাবও ফ্রান্সে ছিল না। কৃষকরা জমি কিনছিল। এর থেকেই বোঝা যায় যে পুঁজির অনুপস্থিতি জনিত সুস্থিতির অভাব কৃষিজগতে পরিলক্ষিত হয়নি। তাছাড়া ফ্রান্সের ছিল এক প্রসারশীল সামুদ্রিক বাণিজ্য যার ফলে তার আমদানি-রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়নি। পুঁজি শ্রম বাণিজ্য বাজার—এক কথায় অর্থনীতির প্রধান দিকগুলি পর্যাপ্ত থাকায় ফ্রান্সের উৎপাদন কখনো নিম্নাভিমুখী হয়নি। স্বদেশ ও বিদেশের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে উৎপাদনকে অনায়াসেই বাড়ানো যায়, এ ক্ষমতা ফ্রান্সের ছিল।

তবুও ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হল না—হল ইংল্যান্ডে। ১৭৮০ থেকে ১৭৯০-এর মধ্যে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ (ইংরাজি পরিভাষায় ৯ মিলিয়ন), কিন্তু শুধু ১৭৮৯ সালেই ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল ২৬০ লক্ষ (ইংরাজি পরিভাষায় ২৬ মিলিয়ন)। ইংল্যান্ডে এই জনসংখ্যাগত অসুবিধার মধ্যে জন্ম নিল শিল্প-বিপ্লবের প্রথম প্রেরণা যা ফ্রান্সে অধিক জনসংখ্যার মধ্যে রইল অনুপস্থিত। ইংল্যান্ডের সামুদ্রিক উদ্যোগের ফলে বহির্বাণিজ্য বাড়ছিল। তার ফলে বাড়ছিল পণ্যের তাগিদ, বাড়ছিল শিল্পের উপর নতুন চাহিদা। শিল্পচাহিদা পূরণ করতে হলে চাই পুঁজি, শ্রম ও সংগঠন। পুঁজি ও সংগঠন ছিল। শ্রম কোথায়? ফ্রান্সে ২৬০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত শ্রম ছিল যাকে প্রয়োজনে গার্হস্থ্য শিল্পের চাহিদা মেটাতে ব্যবহার করা যেত। কিন্তু ইংল্যান্ডে ৯০ লক্ষ মানুষের মধ্যে উদ্বৃত্ত শ্রমের যোগান প্রায় ছিল না বললেই হয়। ৪০০ লক্ষ পাউন্ড স্টারলিং-এর [ইংরাজি পরিভাষায় £ 40 million] মূল্যের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় মানবশক্তি ফ্রান্সে ছিল ২৬০ লক্ষ অধিবাসী। ইংল্যান্ডে ঠিক একই সময়ে ৩২০ লক্ষ [£320] পাউন্ড স্টার্লিং-এর বহির্বাণিজ্যের জন্য

ছিল মাত্র ৯০ লক্ষ মানুষ যাদের মধ্য থেকে উদ্বৃত্ত গার্হস্থ্য শ্রমের (domestic labours) যোগান ছিল প্রায় অসম্ভব। শ্রমের অভাবে যা পূরণ করা সম্ভব নয় যন্ত্রের অভাবে ইংল্যান্ড তা পূরণ করতে চাইল। এইখানেই দেখা দিল যন্ত্র উদ্ভাবনের প্রেরণা, আসল প্রযুক্তি উন্নয়নের ধ্যান, বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার চেষ্টা হল কারিগরিতে। বিজ্ঞান ব্যবহৃত হল প্রযুক্তিতে (application of science of technology), আর প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতে লাগল উৎপাদনে। শিল্প-বিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত প্রতিপালিত হল।

উপরের আলোচনায় একথা কখনো বলা হয়নি যে আঠারো শতকে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা বাড়েনি বা জনসংখ্যার অভাবই ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের প্রধান কারণ। ফিলিস ডিন দেখিয়েছেন যে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা থমকে ছিল, স্থির হয়েছিল ৬০ লক্ষের কাছাকাছি কোন সংখ্যায়। ১৭৪১-১৭৫১-র দশকে তা ত$\frac{৩}{৪}$ শতাংশ বাড়ে, ১৭৫১-১৭৬১ তে বাড়ে ৭ শতাংশ, ১৭৮০-র দশকে ১০ শতাংশ, ১৭৯০ এর দশকে ১১ শতাংশ এবং অবশেষে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তা বেড়ে হয় ১৬ শতাংশে। উন্নয়নশীল শিল্পের জন্য দরকার হয় গতিশীল মানবশক্তি, স্থিতিশীল সমাজ ও বিস্তারশীল পুঁজি। বহির্বাণিজ্য থেকে আসছিল পুঁজি, দেশের ভেতরে আত্মপ্রকাশ করছিল শ্রমের বিস্ফারিত উৎস। ফিলিস ডিন (Phyllis Deane) একেই 'জনশক্তির বিপ্লব' (Demographic Revolution) বলেছেন। এই বিপ্লবের হাত ধরে এসেছিল আরও তিনটি বিপ্লব। ফিলিস ডিন-এর ভাষায় 'কৃষি বিপ্লব', 'বাণিজ্য বিপ্লব' এবং 'পরিবহন বিপ্লব'। এই সমস্ত ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবন, উন্নয়নের ত্বরান্বিত গতি, মানুষ ও বস্তুর দ্রুত স্থান থেকে স্থানান্তরে গমনের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে শিল্পায়নের সহায়ক শক্তি হিসাবে তারা আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল।

ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করার আরও একটা বড় কারণ হল লোহা ব্যবহারের বিস্তার ও লোহা শিল্পের অগ্রগতি। লোহাকে না গলালে তাকে ব্যবহারযোগ্য করা যায় না, আর লোহা গলানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির কয়লা ইংল্যান্ডে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। কয়লাকে বলা হত গলানোর জন্য প্রয়োজনীয় 'সবচেয়ে সুলভ শক্তির মৌল উপাদান'। এই উপাদান ইংল্যান্ডে খুব বেশি ছিল। লোহা ও কয়লার খনিগুলি ছিল খুব কাছাকাছি এবং অনেক জায়গায় পাশাপাশি। ওয়েলস্ (Wales), নর্দাম্বারল্যান্ড (Northumberland) এবং স্কটল্যান্ডে (Scotland) এইসব খনিগুলি অবস্থিত ছিল। ফলে নিষ্পন্ন দ্রব্যকে (finished goods) স্থানান্তরে নেওয়া কঠিন হত না। কয়লা ও লোহার সহযোগে ইংল্যান্ডে দেখা দিল 'যান্ত্রিক কারখানা ব্যবস্থা' ('mechanized factory system')। যার ফলে ন্যূনতম সময়ে ন্যূনতম খরচে এবং ন্যূনতম শ্রমের ব্যবহারের ফলে উন্নতমানের বিপুল পরিমাণ পণ্যের উৎপাদন সম্ভব হল। আর এই উৎপাদনকে তার বহির্বাণিজ্যের নিষ্কাশন পথে মহাদেশের ও সমুদ্রপারের বাজারে চালান করে দেওয়া যেত। এদিকে দেশের ভেতরে বড় কারখানার চারপাশে—ব্রিটেনের মধ্য অঞ্চলের (British Midlands), শেফিল্ড, ইয়র্কশায়ার প্রভৃতি দেশে পেরেক, কাঁটা, ছুরি, ক্ষুর, কাঁচি, চামচ, হাতা ও পাত্র ইত্যাদি ছোট ছোট ধাতব অস্ত্রের ও দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী তৈরির কারুশালা (workshops) গড়ে উঠল। এর ফলে শ্রমিকের জীবিকা ও অন্নের সংস্থান হল। শিল্পোদ্যোগের এই প্রথম পর্যায়ে ইংল্যান্ডের উপনিবেশগুলি থেকে আসত কাঁচামাল আর সেখানে ইংল্যান্ড বিক্রী করত তার উৎপন্ন দ্রব্য (finished products)। নিজের শক্তি প্রয়োগ করে ইংল্যান্ড উপনিবেশের কাঁচামাল কিনত সস্তায় আর নিজের দেশের তৈরি উৎপন্ন মাল বিক্রী করত চড়া দামে। এই সস্তায় কেনা ও চড়া দামে বিক্রী করার নীতি

(Buying cheap and selling dear) যখন ইংল্যান্ড বহির্দেশে প্রয়োগ করছে তখন ইংল্যান্ডই ছিল একমাত্র যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার দেশ **যে দেশ বিশ্ববাজারের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিল একমাত্র উৎপাদক জাতি হিসাবে**। হবসবমেব (Hobsbawm) ভাষায় 'a world market largely monopolized by a single producing nation'। এরকম দেশই তার উৎপাদনকারী ও আন্তেপ্রেনিয়রদের দিতে পারে তাদের উদ্যোগের পুরস্কার মুনাফা। এখানে মনে রাখতে হবে যে, ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত মহাদেশীয় যুদ্ধগুলিই ছিল ইউরোপে শেষ ইঙ্গ-ফরাসী লড়াই। তারপর থেকে আমেরিকা ছাড়া অন্য কোন স্থানে ইংল্যান্ডের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। ("In effect the wars of 1793–1815, the last and decisive phase of century's Anglo Franch duel, virtually eliminated all rivals from the non-European world, except to some extent the young USA"—Eric Hobsbawm)। এইভাবে একমাত্র উৎপাদনকারী দেশ, যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ববণিক এই তিন শক্তির মাত্রাকে একত্রিত করে ইংল্যান্ড দখল করে নিল উন্মোচনশীল এক বিশ্ববাজার। ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবের রথে পড়ল যুগান্তরের পরিবর্তনশীল বিশ্ব শক্তির টান।

উপরের আলোচনা থেকে যে কথাটি স্পষ্ট হল তা এই রকম। ইংল্যান্ডে কেন শিল্প-বিপ্লব হল তা নিয়ে দুরকম ভাবনা দেখা যায়। প্রথম ভাবনা হল যে শিল্প-বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় দুটি উপকরণ—লোহা আর কয়লা ইংল্যান্ডে যথেষ্ট ছিল এবং এই দুই উপকরণকে কাজে লাগিয়ে শিল্পায়ন ঘটানোর মতো অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সমাজমন ইংল্যান্ডে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই ভাবনার পাশে আছে আরেকটি ভাবনা। তা হল এই যে সমস্ত উপাদান ও আনুষঙ্গিক সাংগঠনিকতা বিন্যাস সত্ত্বেও ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব হত না যদি কিনা তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ ধরে বিশ্ববিস্তার, বিশ্বের বাজার দখল ও উপনিবেশের কাঁচামালের উপর খবরদারি করার ক্ষমতা না থাকত। আসলে এই দুই ভাবনাই একে অন্যের পরিপূরক। একটি ঘটনাকে অন্য ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে শিল্প-বিপ্লবের প্রকৃত চরিত্র বোঝা যায় না। এরপর ধ্রুপদী ঐতিহাসিক নোলস্ এর [L.C.A. Knowles, The Industrial and Commercial Revolutions in Great Britain during the Nineteenth Century] একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল। এই উদ্ধৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে ইংল্যান্ডে কেন প্রথম শিল্প-বিপ্লব হল তার সংক্ষিপ্ত মীমাংসা।

"The reasons for the development of the industrial revolution in Great Britain well that she had a ready command of capital, a scarcity of hands, large and expanding markets, a free population, political security, a training in large scale business for over-seas markets, case of access to those markets through her geographical position and her shipping, while his iron and coal fields provided her with the most valuable raw material and motive power for machinery and for iron something." তাহলে দেখা যাচ্ছে পুঁজি, বাজার ও রসদের উপর আধিপত্য একদিকে, অন্যদিকে জনশক্তির অভাব, জনমনের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা গভীরভাবে শিল্পায়নের পশ্চাৎ শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। এর কোনটির অভাব হলে ইংল্যান্ড শিল্পায়নে অগ্রসর হতে পারত না।

১.৬ শিল্পায়নের দুই পর্ব

দুটি পর্বে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছিল। একপর্বে সড়ক পথে, নদী ও খালের মাধ্যমে, নৌকায় ও

পালতোলা জাহাজে পণ্যসামগ্রী চলা ফেরা করত। পরের অধ্যায় যন্ত্রের বিস্তার ঘটল বিপুলভাবে। বাষ্পশক্তির ব্যবহার হতে লাগল, রেলব্যবস্থা ও বাষ্পযানের আবির্ভাব ঘটল। বাষ্পপোত, টেলিগ্রাফ ও রেলব্যবস্থা পণ্যের আনা-নেওয়াকে সহজ করল, যোগাযোগকে সরল করল, বিশ্ববাজার দখলকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে এল। তার সাথে তাল রেখে শ্রমের বিন্যাস ও বিভাজন এবং ব্যবসায়িক সংগঠন পরিবর্তিত হল প্রথমে স্থানীয় পর্যায়ে, পরে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে এবং সর্বশেষে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। বাষ্পশক্তিকে প্রয়োগের দ্বারা প্রযুক্তির পরিবর্তনও দুটি পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৮৩০-এর দশকের আগে বাষ্পশক্তিকে শুধু উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হত। ডেভিড টমসন জানিয়েছেন যে ১৮৩০ সালের পর থেকে বাষ্পশক্তিকে যানবাহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতে লাগল। এরপর থেকে আসতে লাগল বড় মাপের বিস্ময়কর সামাজিক পরিবর্তন। আসল বড় মূলধনি উদ্যোগ, ট্রেড ইউনিয়ন, শহর প্রশাসনের জন্য পৌরসভা। এসব সত্ত্বেও শিল্প-বিপ্লবের গতি ও তার প্রারম্ভিকতা (earliness) নিয়ে কোন অতিরঞ্জন থাকা ঠিক নয়। ১৮১৫ সাল নাগাদ ও ইংল্যান্ডের শিল্প শ্রমিকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ বড় বড় কারখানায় (factory) কাজ করত এবং বেশির ভাগ মানুষও তখন নগরায়িত জীবন যাপন করতে শেখেনি। ফ্রান্সেও শিল্প এককগুলি বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত ছোট ছোট ছিল। একথা জানিয়ে ডেভিড থম্পসন (David Thompson, Europe since Napoleon) বলেছেন যে পূর্ব ইউরোপে শিল্পায়ন হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে। ইউরোপে বড় শহরের সার্বিক আবির্ভাব হয়েছিল ১৮৭০ সালের পর। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সূচনাকালে ইউরোপের একটি দেশের অর্থনীতি শিল্পায়িত হয়েছিল। তা হল ইংল্যান্ডের অর্থনীতি। ১৮৫০ সাল নাগাদ লক্ষ করা গিয়েছিল যে স্পেন, পর্তুগাল, স্ক্যান্ডেনেভিয়া, সুইজারল্যান্ড ও বলকান অঞ্চল মিলিয়ে ১০০ মাইল রেললাইন ইউরোপে পাতা হয়েছিল। তার অর্থ হল যে ১৮৫০ সালের আগে এক ইংল্যান্ড ছাড়া বড় মাপের শিল্পায়ন ইউরোপে আর কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ বৃহত্তর অর্থে ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লব উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ঘটনা, যদিও ১৮৩০-এর দশকে আমেরিকায় ও ১৮৪০-এর দশকে জার্মানিতে শিল্পায়নের প্রারম্ভিক প্রকাশ দেখা গিয়েছিল।

১.৭ শিল্প-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

শিল্প-বিপ্লবের প্রথম পর্বের বৈশিষ্ট্য হল যে তা ইংল্যান্ডের অর্থনীতিকে এবং তার সমাজ জীবনকে শিল্পায়িত করে দিয়ে ১৭৫০ থেকে ১৮৫০-এর মধ্যে বিশ্বকোষ রচয়িতারা যাকে বলেছেন 'ব্রিটেন' নামে একটি সর্বাধিক আধুনিক রাষ্ট্রের আবির্ভাবকে সূচিত করেছিল। আর তা করতে গিয়ে পরিবর্তনের কয়েকটি পর্যায়কে তা চিহ্নিত করেছিল। প্রাক্ শিল্পায়িত সমাজে বেশিরভাগ বস্তু উৎপন্ন হত বাড়ির ভেতরে, ছোট কারখানায় বা কারুশালায় (workshops)। আর তা হত ছোটখাটো শ্রমবিভাজনের মধ্য দিয়ে, মানুষের শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে, পশুর পেশী শক্তির উপর নির্ভর করে। হাতযন্ত্র (Hand tools) ব্যবহার করে উৎপাদন করা হত। শিল্প-বিপ্লব ভিন্নতর উৎপাদন বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে এল। শ্রমের বদলে এল যন্ত্র, কারুশালার বদলে এল বড় ফ্যাক্টরি, পেশীশক্তি ও বায়ুশক্তির বদলে এল প্রথমে বাষ্প এবং পরে বিদ্যুৎশক্তি। জ্বালানি হিসাবে কাঠের বদলে এল কয়লা, ভারবাহিতার আধার হিসাবে কাঠের বিকল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল লোহা। এইভাবে কৃষি ও হাতশস্ত্র অর্থনীতির রূপান্তর ঘটল শিল্প প্রধান যান্ত্রিক নির্মাণ অর্থনীতিতে (industry and machine manufacture

economy)। এই রূপান্তরের কতগুলি নিশ্চিত বৈশিষ্ট্য ছিল যাকে শুধুমাত্র প্রযুক্তিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ (application of science to technology) বললে ভুল হবে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর মানুষ এই ত্রিশক্তির সমন্বিত পরিবর্তন ঘটছিল। এই পরিবর্তনের যদি একটি পর্যালোচনা করা যায় তবে শিল্প-বিপ্লবের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পাই।

(এক) নতুন মৌল উপাদান (new basic materials) লোহা আর ইস্পাতের অবাধ ব্যবহার।

(দুই) নতুন উদ্দীপনা সম্পদ (new energy resources) জ্বালানি ও সঞ্চালক শক্তির (fuel and motive power) ব্যবহার। এর মধ্যে আছে কয়লা, বাষ্পীয় শকট (steam engine) বিদ্যুৎ, পেট্রোলিয়ম ও গ্যাস এবং অভ্যন্তর—দাহ্য যন্ত্র (internal combustible engine)।

(তিন) 'স্পিনিং জেনি' (Spining jenny) ও শক্তি চালিত তাঁত (power loom) ইত্যাদির মতন দ্রুত সঞ্চালনশীল যন্ত্র যার দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম মানবশক্তি (human energy) ও পশুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনেক বেশি, অনেক দ্রুত ও অনেক উচ্চমানের পণ্য উৎপাদন করা যায়।

(চার) কাজের একটি নতুন সংগঠন, যাকে বলা হয় ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার দিকগুলি হল নগর কেন্দ্রিকতা, বৃহৎ কারখানার আত্মপ্রকাশ, অধিকতর শ্রমিক নিয়োগ, শ্রমের নবনব বিভাজন, কাজের বিশেষিকরণ (specialization), পরিবহন ও যোগাযোগের নতুন উন্নয়ন, বাষ্পশক্তির অধিকতর ব্যবহার, পুঁজির ঘনীভবন, ঘিঞ্জি বস্তির আবির্ভাব, শ্রমিক জীবনমানের অবনতি এবং এ সবের মধ্য দিয়ে ব্যাপক উৎপাদনবৃদ্ধি এবং শ্রমিক শোষণের মধ্য দিয়ে আগ্রাসী মুনাফালাভের বেপরোয়া তৎপরতা।

(পাঁচ) দ্রুত নগরায়ণ, শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান, নতুন শাসনতন্ত্রের আবির্ভাব যার ফলে বংশভিত্তিক শাসন (dynastic rule) উঠে গিয়ে সমাজভিত্তিক শাসন (communitarian rule) আত্মপ্রকাশ করল এবং পুরনো দিনের অবসানে জনগণ 'প্রজা' থেকে হল 'নাগরিক'।

(ছয়) শ্রমিকরা দক্ষ ও অদক্ষে ভাগ হয়ে গেল। নতুন ও বিশেষিত দক্ষতা (new and distinctive skills) নিয়ে আবির্ভূত শ্রমিকের কাজ ও কাজের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক বদলে গেল। হাত ব্যবহারকারী কারিগর (craftsman) থেকে তারা পরিবর্তিত হল যন্ত্রবিদ (machine operator) তথা এক নৈর্ব্যক্তিক এককে (impersonal unit) পরিণত হল।

(সাত) মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক মানবিকতার পরিবর্তে পুঁজি বিনিয়োগ ও শ্রম প্রয়োগের নিরিখে বিচার করা আর্থিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিরূপিত হতে লাগল। অর্থাৎ ব্যক্তিগত দেওয়া-নেওয়ার সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন খসে গেল।

উপরে বর্ণিত কোন পরিবর্তনই সম্ভব হত না যদি না লোহা ও কয়লার অঙ্গাঙ্গী ব্যবহার না বাড়ত এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে যানবাহন ও যোগাযোগ, এক কথায় পণ্য ও চিন্তার পরিবহন না বাড়ত। আঠারো শতকে ইংল্যান্ড জলকে শক্তি হিসাবে এবং বায়ুকে সঞ্চালক হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বায়ু ছিল অনিশ্চিত, জলও ছিল সর্বৈব নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তা শুকিয়ে যেত, স্ফীত হয়ে বন্যা হত, জমে গিয়ে বরফ হত।

শিল্প-বিপ্লব জল ও বায়ুর বিকল্প হিসাবে এনে দিল বাষ্পশক্তি—বিস্ময়করভাবে স্বচ্ছন্দ একটি শক্তি যা অনিশ্চিত নয়, শুকিয়ে যায় না বা জমে না। সঞ্চালক শক্তি হিসাবে বাষ্পের ব্যবহার (use of steam as a motive power) শিল্প-বিপ্লবের একটি অনবদ্য বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা উৎপাদনে শ্রমের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ বন্ধ হল, মানুষের কায়িক ক্ষয় রোধ হল, মানুষের টেনে নেওয়ার ও উত্তোলনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল, ফলে শ্রমনিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির (Labour-intensive productive process) হ্রাস পেল এবং পশুশক্তির উপর নির্ভরতা কমে গেল। অর্থাৎ এর পর থেকে যে কোন শক্তিকে (energy) একটি নিশ্চিত সঞ্চালক শক্তিতে (motive power) রূপান্তরিত করার ক্ষমতা মানুষের করায়ত্ত হল। এর আগে অন্য কোন শক্তি, যেমন জল ও বায়ু এতখানি রূপান্তরযোগ্য (transferable) ছিল না। জলকে বাষ্পীভূত করতে হলে চাই জ্বালানি সেটা হল কয়লা। আবার বাষ্পশক্তির চাপ সহ্য করতে পারে এই রকম মজবুত পদার্থের প্রয়োজন হল। কাঠ পচনশীল ও নরম। তাই এল লোহার ব্যবহার। লোহা যখন এল তখন মানুষের উৎখনন— শক্তি ও পণ্য পরিবহন ক্ষমতা বাড়ল। ভাবুন পশুর পিঠে বা নৌকায় মাল আর অন্যদিকে লোহা দিয়ে নির্মিত বিরাট জাহাজ বা শকটে মাল—কোনটির ভারবহন ক্ষমতা বেশি। আবার তুলনা করুন কাঠকয়লার চুল্লি (charcoal furnace) ও বাতচুল্লি (Blast furnace) কার তাপপ্রদান জনিত বিগলন ক্ষমতা বেশি। এই অতিরিক্ত ক্ষমতাই মানুষের দক্ষতাকে বাড়িয়ে তার সভ্যতাকে ঊর্ধ্বমুখী করবে।

১.৮ ইংল্যান্ড-ভিন্ন অন্য দেশে শিল্প-বিপ্লব

ইংল্যান্ড ভিন্ন অন্য দেশে শিল্প-বিপ্লব দেরিতে এসেছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে নিয়ে যে হ্যাপসবার্গ (Hapsburg) সাম্রাজ্য তা উনিশ শতকে অর্থনীতিগতভাবে একটি শক্তিশালী দেশ ছিল না। এই দেশে ছিল এগারটি প্রধান জাতি (races), দশটি প্রধান ভাষা এবং তেইশটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা [পঠিতব্য seton Watson, German, Slav and Magyar, p. 10]। অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি উভয় দেশের সরকারের লক্ষ্য ছিল তাদের প্রজাবর্গের মনে উদগত জাতীয়তাবাদের ভাবধারাকে প্রশমিত রেখে সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্যকে স্থির রাখা। এই রাষ্ট্রিক কাঠামো অবিসংবাদিত দুর্বলতাকে কাটাতে না পারায় অস্ট্রিয়া বা হাঙ্গেরি কেউই কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্যে কোন প্রসারশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে তাদের অর্থনীতিও সবল ছিল না। শিল্পায়নে নতুন উড়ান (take off) তাদের সম্ভব ছিল না।

ফ্রান্স কয়লা সম্ভারে ছিল দুর্বল, আর হল্যান্ডে কয়লা ছিল না। কয়লা না থাকায় সেখানে শিল্পায়নের ধারা ব্যাহত হয়েছিল। এবং পাশাপাশি আমেরিকা বা জার্মানিতে উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যেত বলে তাদের শিল্পায়নের পথে যেতে অসুবিধা হয়নি। ফ্রান্স দীর্ঘদিন ধরে মানববিদ্যা ও কলাবিদ্যায় উন্নতি করেছিল। ফলে তার কারু ও কলা শিল্প সভ্যতার মূল্যবান উপকরণ হিসাবে উচ্চ দামে বিক্রয় হত। ফলে ফরাসীদের মানসিকতায় কারিগরি উদ্ভাবনের স্পৃহা ছিল কম। তাছাড়া কলা শিল্প-সামগ্রীর কদর হত তার নিজস্ব গুণমানের উপর তার ফলে এই ধরনের সামগ্রীর রাশিকৃত উৎপাদন (mass production) সম্ভব ছিল না। ফলে আধুনিক শিল্পায়িত উৎপাদনে রাশিকৃত পণ্যের সম্ভার তৈরি করা, তার বিপণনের জন্য বাজার খোঁজা, তার উৎপাদনের জন্য মৌল যন্ত্র তৈরি করা—এর কোনটির দিকে ঝোঁকই ফ্রান্স দেখাতে পারেনি। ফলে ইংল্যান্ডের অনেক আগে থেকে অগ্রসরশীল শিল্প সত্ত্বেও ১৯১৪ সালের আগে ইংল্যান্ডের সমকক্ষ পূর্ণ শিল্পব্যবস্থা ফ্রান্স গড়ে তুলতে পারেনি।

তাছাড়া ফ্রান্সে জনসংখ্যা বেশি থাকায় উদ্বৃত্ত শ্রমের ভাণ্ডার তার ছিল। ফলে শ্রমের অভাব তাকে কখনো ভুগতে হয়নি। অতএব শ্রমের বিকল্প যন্ত্রের উদ্ভাবনের কথা সে ভাবেনি। রাশিয়াতে বেশির ভাগ মানুষ থাকত শহরের বাইরে। সেখানে জারতন্ত্রের নিরঙ্কুশ শাসন ও শোষণে রাষ্ট্রের উদ্যোগ ছাড়া মানুষের ব্যক্তি পর্যায়ে বা সমাজ পর্যায়ে কোন শিল্পোৎসাহ গড়ে উঠতে পারেনি। উনিশ শতকের শেষে ফ্রান্সের পুঁজির বিনিয়োগ হতে থাকে রাশিয়াতে। তার পর থেকে ১৮৯০-১৯১৪ এই সময়ের মধ্যে রাশিয়াতে শিল্পায়ন দেখা দেয়। রাশিয়াতে ১৮৫৫ সালে মোট জনসংখ্যা ছিল ৬০,০০০০০০ বা ছয় কোটি। এর মধ্যে ৪০,০০০০০০ বা চার কোটি ছিল সার্ফ। সমস্ত দেশ দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষে ডুবে ছিল। ফলে শিল্প-বিপ্লবের প্রয়োজনীয় পরিবেশ রাশিয়াতে ছিল না।

ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের আলোচনা করতে গেলে স্মরণ রাখতে হবে যে সেখানে সমস্ত মহাদেশ জুড়ে যেখানে যেখানে লোহা আর কয়লা খনি ছিল ঠিক সেখানে বা তার সংলগ্ন স্থানেই এক বিরাট জনবসতির রেখা গড়ে উঠেছিল। গবেষকরা দেখেছেন যে এই খনিরেখা (line of mines) এবং বিস্ফারিত জনবন্ধনী (broad population belt) শুরু হয়েছিল স্কটল্যান্ডে এবং ব্যাপ্ত হয়েছিল মহাদেশের মধ্য পর্যন্ত। সেখান থেকে ভাগ হয়ে একটি শাখা দক্ষিণে চলে যায়, আরেকটি শাখা রয়ে যায় উত্তরের শাখা রূপে। এই উত্তরের শাখার শুরুর বিন্দু হল গ্লাসগো। সেখান থেকে শুরু হয়ে ইংল্যান্ডের ভেতর দিয়ে খনি ও জনবসতির এই বন্ধনী চলে যায় বেলজিয়াম ও উত্তর ফ্রান্সে। তারপর রাইন-অঞ্চল, সার উপত্যকা (Saar valley) হয়ে ওয়েস্টফ্যালিয়া (Westphalia), স্যাক্সনি (Saxony) ও সাইলেশিয়া (Silesia) স্পর্শ করে রাশিয়ার ডনেজ (Donetz) উপত্যকা পর্যন্ত প্রবহমান এই রেখা। খনি রেখার সঙ্গে যুগলমিলনে যে জনবসতির ক্ষেত্র গড়ে ওঠে সেই ক্ষেত্র বরাবর শিল্প-বিপ্লবের অক্ষরেখা তৈরি হয়েছিল। তার উপরেই স্থাপিত হয়েছিল সমস্ত নির্মাণ-শিল্প। এইভাবে প্রকৃতির দেওয়া ক্ষেত্রের উপরই শিল্পায়নের অভ্যুদয় ঘটেছিল। কয়লা আর লোহার ক্ষেত্রগুলি বরাবর এইভাবে জনবসতি গড়ে ওঠা কোন আধুনিক ঘটনা নয়, বরং সভ্যতার অনেক পুরানো ব্যাপার। কিন্তু যখন যন্ত্র আবিষ্কার হতে লাগল তখন উৎখননের জন্য জনশক্তির যোগান সংলগ্ন জনবসতিগুলি থেকে আসতে লাগল। যন্ত্রচালকের কাজ সম্পন্ন করার জন্য মানবশ্রমের চাহিদা পূরণ করেছিল মহাদেশময় সুনিশ্চিত জনবসতির অক্ষরেখা।

১.৯ নতুন আবিষ্কার : কৃষিতে বিপ্লব

শিল্প-বিপ্লবকে বলা হয় নীরবে সংঘটিত একটি ঘটনা। এর প্রস্তুতি চলছিল অনেক দিন ধরে। রেনেশাঁস মানুষের মনকে যুক্তিবাদী করে তাকে ফিরিয়ে এনেছিল পরলোক থেকে ঐহিকতার দিকে। ঐহিকতার মধ্যে লুকিয়ে থাকে প্রত্যক্ষের দাবি, প্রতিনিয়তের চাহিদা, আর তার পরিপূরণের আকাঙ্ক্ষা। ফলে মানব প্রকৃতির সহজ নিয়মে শুরু হল রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার চর্চা, গণিতের বিচার, বলবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ। ইতিমধ্যে আবিষ্কার হল মুদ্রাযন্ত্রের, জ্ঞানের বিস্তার সহজ হল। গবেষণা করার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার, মাপজোক করার, হিসাব-নিকাশ করার একটি প্রবণতা আরম্ভ হল। কিছু লোক প্রশ্ন করতে লাগল চাষবাস ও কৃষিজগতের বিভিন্ন রীতিনীতির, কারণ তখন কৃষিই ছিল মানুষের সবচেয়ে বড় শিল্প। ১৭০১ সালে **জেথরো টুল** (Jethro Tull) গভীরভাবে মাটি খননের একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন যার দ্বারা মাটির ভেতর অনেকখানি কেটে বীজবপন করা যেত।

জমিকে নতুনভাবে চাষ করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল। লর্ড টাউনশেন্ড (Lord Townshend) পর্যায়ক্রমে শস্য চাষ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। জেথরো টুলের নয়া চাষ পদ্ধতি এবং টাউনশেন্ডের শস্যের পর্যায়ক্রম চাষ (rotation of crops) কৃষিকাজের নতুন দিগন্ত খুলে দিল। এদিকে কৃষিকাজের প্রকরণ নিয়েও ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছিল। হকাম-নিবাসী জনৈক কোক (Coke of Holkham) নতুন কৃষি প্রকরণ তৈরি করেন। জেথরো টুল সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের (১৬৭৪-১৭৪১) মানুষ। তিনি লক্ষ করলেন যে বীজবপনের সনাতন প্রক্রিয়াটি হল হাতে করে বীজ নিয়ে হাওয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া। ইংরাজি ভাষায় তাকে বলা হত broadcasting handfuls on to the land। এই পদ্ধতিতে বীজ ইতস্তত মাটিতে ছড়াত এবং অনেক বীজ নষ্ট হত। জেথরো টুল সরলরেখায় মাটি কেটে সারিবদ্ধভাবে (in rows) বীজধান উৎপাদনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করলেন। শুধু তাই নয় ঘোড়া দিয়ে লাঙল চাষের ব্যবস্থাতেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। এর ফলে শস্য ক্ষেত্রের আগাছা ও পরগাছা সব বিনষ্ট হত এবং জমি পরিষ্কার থাকত। জেথরো টুলের সমবয়সী ছিলেন লর্ড টাউনশেন্ড (১৬৭৪-১৭৩৮)। তিনি দেখালেন যে একই জমিতে প্রতিবছর একই শস্য চাষ করলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। তাই তিনি নিজের ক্ষেতে পর্যায়ক্রমে একবছর গম, পরের বছর শালগম, তৃতীয় বছর ওটস্ বা বার্লি এবং চতুর্থ বছর ক্লোভার (clover) বা সেই জাতীয় অন্য শস্য চাষ করে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেন। তিনি দেখালেন যে গমের পর যে শুধু শাল গমই চাষ করতে হবে তা নয়, শালগমের মতো শিকড় আছে এইরকম যে কোন শস্যের চাষ করা যাবে। এইভাবে চার বছরে চার শস্যের পর্যায়ক্রমে (four-crop rotation) থাকলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয় না। গম জমি থেকে অনেক রসদ শুষে নেয় ফলে জমি নিঃশেষিত হয়। কিন্তু শালগম এতটা নেয় না। বরং শালগম চাষ করার সময়ে জমিকে পরিষ্কার করে নিতে হয়। তাতে আগাছা জমির ক্ষতিসাধন করতে পারে না। শুধু তাই নয়, শালগম জাতীয় ফসল শীতকালে পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত। ফলে শীতকালে পশুদের বাঁচিয়ে রাখা আরও সহজতর হল। ইতিপূর্বে শীতের প্রারম্ভে অনেক পশুকে হত্যা করা হত কারণ তাদের বাঁচিয়ে রাখা যাবে না বলে। এখন আর তার প্রয়োজন হল না। এর পর থেকে সারা বছর তাজা মাংস পাওয়া সম্ভব হল। তার ফলে ইংরাজদের খাদ্য ব্যবস্থা বদলে গেল। লর্ড টাউনশেন্ডের ব্যবস্থা যে সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র সমানভাবে গৃহীত হয়েছিল তা নয়। তখনও একটা চাষের পর জমিকে অলসভাবে ফেলে রাখার (fallowing) প্রথা চলছিল। প্রথম প্রথম কৃষকরা আপত্তি করলেও পরে পর্যায়ক্রমে শস্যচাষের নীতি তারা মেনে নিয়েছিল এবং তার ফলে ইংল্যান্ডের কৃষি-অর্থনীতি সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর হয়ে পড়েছিল।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে রবার্ট বেকওয়েল (১৭২৫-১৭৯৫) গার্হস্থ্য পশু প্রজনন (stockbreeding) ও পশুপালনের নতুন পদ্ধতি প্রচলন করেন। আগে মেষ প্রজননে বাছাবাছি করা হত না। রবার্ট বেকওয়েল (Robert Bakewell) বিশেষ বিশেষ মেষ বেছে নিয়ে প্রজননের ব্যবস্থা করান। এর ফলে উৎকৃষ্ট লোম ও সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন মেষের জন্ম হতে লাগল। গবাদি পশুর ক্ষেত্রে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ১৭৫০ নাগাদ সে কাজ করেছিলেন চার্লস ও রবার্ট কোলিং (Charles and Robert Colling)। তাঁরা শর্ট হর্ণ (shorthorns) বা ছোট শিং বিশিষ্ট এক ধরনের গবাদি পশুর প্রজনন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই শর্ট হর্ণ গরুর দুধ ও মাংস ইংল্যান্ডের খাদ্যাভ্যাসকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। নতুন যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়েছিল তা দিয়ে চাষ করতে গেলে বড় জমির দরকার হয়। ফলে ছোট ছোট জমিকে একসঙ্গে রেখে

একটি সংলগ্ন বড় অঞ্চলকে ঘিরে ফেলার প্রবণতা দেখা দিল। এই ঘিরে ফেলাকে বলা হত এনক্লোজার (Enclosure)। এই সময়ে শহরে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। অনেক দরিদ্র কৃষক নিজেদের জমিজমা বিক্রী করে মজুর হিসাবে শহরে চলে যাচ্ছিল। তাদের জমিগুলিকে একত্রিত করে বড় জমিতে পরিণত করে যন্ত্রায়িত কৃষির (mechanized farming) জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল।

১.১০ নতুন আবিষ্কার : বস্ত্রশিল্পে বিপ্লব

বস্ত্রশিল্পে উৎপাদনে দুটি ভাগ ছিল—সুতো কাটা (spining) এবং তাঁত বোনা (weaving)। তিন ভাবে এই দুই কাজ সম্পন্ন হত—(১) কোন বাড়িতে একটি ছোট যন্ত্র বসিয়ে একটি পরিবারের দু-একজন গেরস্থালি কর্মের মতো তা সম্পাদন করতে পারত; (২) একটি বাড়িতে (house) বেশ কিছু ছোট বড় যন্ত্র বসিয়ে দু-চারটি পরিবার বা এক এলাকার কিছু মানুষ সে কাজ করতে পারত। এই দুই কাজের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য ছিল না কারণ এই উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হত হস্তচালিত যন্ত্র। শুধু তফাত ছিল পুঁজির বিনিয়োগে ও শ্রমের যোগানে যার দ্বারা কাজের কিছু গতিবৃদ্ধি হত। (৩) তৃতীয় পদ্ধতি হল তাঁতযন্ত্রে শক্তি (power) প্রয়োগ করে কাজের গতি বাড়ানো, সময় সঙ্কোচন করা এবং উৎপাদন চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের বিকল্প গড়ে তোলা। তাঁত বোনায় বিপ্লব এনেছিলেন ১৭৬৪ সালে **জেমস হারগ্রিভস** (James Hargreaves)। তিনি **স্পিনিং জেনি** (Spinning jenny) নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যার মধ্যে আটটি **স্পিন্ডল** (Spindle) বা তকলি থাকত। এর দ্বারা ছোট ছোট শলাকার (rod) সাথে লাগিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অনেক আঁশকে (yarn) ঘূর্ণায়মান রেখে একসঙ্গে অনেক সুতো কাটা যেত। এর দ্বারা আঁশ বা সুতোর আড়াআড়ি প্যাঁচও (wefts) সম্ভব হল। এরপর ১৭৬৮ সালে আবিষ্কৃত হল **রিচার্ড আর্করাইটের** (Richard Arkwright) জল বা **ওয়াটার ফ্রেম** (water frame)। আড়াআড়িভাবে নিবন্ধ সুতোকে (warps) তাঁত যন্ত্রে বাঁধার এটি ছিল অভিনব পদ্ধতি। ১৭৭২ সালে ডার্বিশায়ারের (Derbyshire) অন্তর্গত ক্রমফোর্ড (Cromford) নামক স্থানে তিনি যে কল (mill) স্থাপন করেছিলেন সেখানে তিনি জল শক্তির দ্বারা তাঁর যন্ত্রচালনার ব্যবস্থা করেন। এই দুই যন্ত্রই ধীরে ধীরে বাতিল হয়ে গেল যখন ১৭৭৯ সালে (মতান্তরে ১৭৭৫ সালে) **স্যামুয়েল ক্রম্পটন** (Samuel Crompton) **স্পিনিং মিউল** (Spinning Mule) নামে নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। পূর্বতন যন্ত্রগুলির বিজ্ঞান ও নক্‌শাকে কাজে লাগিয়ে এই মিউল তৈরি হয়েছিল। ক্রম্পটনের জীবনকাল ১৭৫৩ থেকে ১৮২৭। অতএব তিনি অপেক্ষাকৃত পরের প্রজন্মের মানুষ। হারগ্রিভসের 'জেনি' এবং আর্করাইটের জল ফ্রেমের যে সুতো বের হত সে সুতো ছিল মোটা এবং কর্কশ। ১৭৭৯ সালে তিনি **হল-ইথ উড হুইল** (Hall-i'th Wood Wheel) বলে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন (তাঁর তন্তুবায় পিতা মাতার সঙ্গে শৈশবে যে বাড়িতে তিনি থাকতেন তার নাম ছিল Hall-ith wood) এই যন্ত্রই পরে **মিউল** নামে বিখ্যাত হয়। এই যন্ত্রে মসলিনের মতো সরু কাপড় বোনা যেত। পরবর্তীকালে ক্যাম্বিক জাতীয় কাপড়ও এযন্ত্রে বোনা হত। হারগ্রিভস্, আর্করাইট ও ক্রম্পটনকে বলা হয় শিল্প-বিপ্লবে বস্ত্রশিল্পের ত্রয়ী। তাঁরা তুলো থেকে সুতো (cotton spining) এবং সুতো থেকে তাঁত বোনা (cotton weaving) শিল্পে বিপ্লব এনে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লম্বা এবং ছোট উভয় রকম পশমই 'জেনি' এবং 'মিউলে' বোনা হত। ১৮২০ সালের মধ্যে হস্তচালিত যন্ত্রে পশম ও সুতোর কাটার কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সুতো কাটার সাথে বস্ত্রশিল্পে জড়িয়ে থকে বয়ন বা বুননের কাজ (weaving)। ইংল্যান্ডে সুতো কাটা হত প্রচুর, কিন্তু সেই তুলনায় তাঁতি যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল না। ফলে দরকার হল এমন যন্ত্রের যে যন্ত্র একজন বা দুজন চালিয়ে বিপুল পরিমাণ কাপড় বুনতে পারবে। ১৭৩৮ সালে **জন কে** (John Kay) **উড়ন্ত মাকু** (Flying Shuttle) আবিষ্কার করে এই সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন। এই যন্ত্রে মাকুটি দুটি দড়ির মধ্যে বাঁধা থাকত এবং দ্রুতগতিতে তা যন্ত্রের এদিক থেকে ওদিকে চলাফেরা করতে পারত। একটি হাতলের সাহায্যে তা চালানো হত। এর ফলে বাড়িতে বসেই তাঁতিরা অনায়াসেই অনেক বড় বড় কাপড় অল্প সময়ের মধ্যে বুনে ফেলতে পারত। এর ষাট-সত্তর বছরের মধ্যে **কার্টরাইট, জনসন** এবং **হরকস** (Cartwrigth, Johnson and Horrocks) শতি চালিত বুনন যন্ত্র আবিষ্কার করে কাপড় বোনার শিল্পে বিপ্লব এনে দিলেন। সূতিবস্ত্র শিল্পে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত হস্ততাঁত চালু ছিল। শক্তিচালিত তাঁতে লম্বা পশম (যাকে বলা হত 'উশ'—worsted) বোনা শুরু হয় ১৮২০ থেকে ১৮৩০-এর দশকে। কিন্তু ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-এর দশকের আগে পশম ফ্যাক্টরি শিল্প হয়ে উঠতে পারেনি। ১৮৫০-এর দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লিনেন বোনার কাজে শক্তির ব্যবহার যথেষ্ট হয়ে ওঠেনি। লেস এবং হোসিয়ারি শিল্প ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার মধ্যে চলে আসে ১৮৪০ থেকে ১৮৮০-র মধ্যে। এই একই সঙ্গে গড়ে ওঠে বস্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত রসায়ন শিল্প।

১.১১ নতুন আবিষ্কার : যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব

শিল্প-বিপ্লবের ফলে রাস্তাঘাট, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল। ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই পণ্যসামগ্রীকে বাজারে প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল। আবার সেই পণ্য উৎপাদনের জন্য বাইরের থেকে কাঁচা মালের আমদানি করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিল। এই পণ্য উৎপাদন-বণ্টন-বিপণনের তাগিদে যানবাহন, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটতে লাগল। **জেমস ওয়াট** (James Watt, ১৭৩৬-১৮১৯) বাষ্পশক্তির মধ্যে চাপ দিয়ে গতিসঞ্চার করার যে ক্ষমতা তাকে ব্যবহার করে বাষ্পীয় পোত (Steam Engine) আবিষ্কার করলেন। তার আগে **নিউকোমেন**-এর (Newcomen) ইঞ্জিন চালু ছিল। ওয়াট যে ইঞ্জিন আবিষ্কার করলেন তাতে একটি পিষ্টনকে (piston) উপরে ও নীচে ঠেলে গতিসঞ্চার করার জন্য বাষ্পশক্তিকে ব্যবহার করা হল। যে বৈজ্ঞানিক নীতির উপর নিউকোমেন-এর ইঞ্জিন চলছিল সেই নীতিকেই জেমস ওয়াট বদলে দিলেন। ১৭৬৫ সালে তিনি এ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১১ বছর পরে তাঁর সাফল্য আসে। এর আগে বাষ্প-ইঞ্জিন দিয়ে মাটির নীচ থেকে যেমন খনি থেকে জল তোলা হত। এবার অন্য কাজেও এই ইঞ্জিন ব্যবহার করা শুরু হল। এর কিছু দিনের মধ্যে জেমস ওয়াট আরও জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন। যেমন বিশেষ কালির দ্বারা পুঁথি পত্রের প্রতিলিপি করণ (Duplication by a specially prepared ink), জলের উপাদান কী, তার আবিষ্কার, হাইড্রোমিটারের উদ্ভাবন, জল-মোচড়ক-ঠেলকের (marine screw propeller) আবিষ্কার ইত্যাদি। বৈদ্যুতিক শক্তি মাপার যে একককে (unit) আমরা ওয়াট বলি (যেমন ৬০ ওয়াটের বাল্ব ইত্যাদি) তাও তাঁর নাম থেকে উদ্ভূত।

জেমস ওয়াটের আবিষ্কারের কিছু দিনের মধ্যেই **জর্জ স্টিফেনসন** (George Stephenson, 1781-1848), তাঁর লোকোমোটিভ ইঞ্জিন তৈরি করে ফেললেন। আগে কয়লা বোঝাই সবই ঘোড়ায় টানত। এবার

লোহার লাইন পেতে তার উপর শকট বসিয়ে বাষ্প শক্তির দ্বারা চালানো হল। ১৮১৪ সালে চার মাইল রাস্তা এইভাবে চালানো হল। বাষ্পের উদ্বৃত্ত অংশকে বর্জ্য করে চিমনির মধ্যে দিয়ে বাইরে বের করে দিয়ে ইঞ্জিনের গতিকে বাড়িয়ে তিনি দেখালেন যে বাষ্পশক্তির যে প্রগাঢ় চালক ক্ষমতা আছে তাকে ব্যবহার করে দ্রুত অনেক পরিমাণ পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহন করা যায়। ১৮২৫ সালে তাঁর 'লোকোমোশন নং ১" (Locomotion No. 1") স্টকটন-ডার্লিংটন রেলওয়েতে (Stockton-Darlington Railway) চলা শুরু করল। এর চার বছর বাদে তাঁর 'রকেট' লিভারপুল ম্যানচেষ্টার রেল কোম্পানির কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনের পুরস্কার পেল। এর ৫০ বছরের মধ্যে ইংল্যান্ডে ১৫০০০ মাইল রেললাইন পাতা হল।

চক্রযানের সঙ্গে সঙ্গে জলযানের উন্নতি হচ্ছিল। ১৮০৩ সলে আমেরিকার একজন ইঞ্জিনিয়ার **রবার্ট ফুলটন** (Robert Fulton, 1765-1815) **বাষ্প-নাও বা স্টিমবোট** (Steam boat) আবিষ্কার করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তিনি জলে চলার ইঞ্জিনের (marine engine) উদ্ভাবক ছিলেন না, স্টিমবোটের গঠনতন্ত্র বাষ্পশক্তি প্রয়োগের দ্বারা তার ভেতর গতির সঞ্চার এইসবের কৃৎ-কেলিল তিনি দিয়েছিলেন। ১৮০৭ সালে একটি বড় স্টিমবোট তৈরি করে তার নাম দিয়েছিলেন **ক্লেরমন্ট** (Clermont)। ইংল্যান্ডের অন্তর্গত বার্মিংহামের বিখ্যাত **বোল্টন এন্ড ওয়াট** কোম্পানি (Boulton and Watt) তা তৈরি করেছিল। হাডসন নদীতে দেড়শত মাইল রাস্তা এই স্টিমবোট ৩২ ঘণ্টায় অতিক্রম করেছিল। যেমন ১৮২৫ সালে 'লোকোমোশন নং ১' ছিল প্রথম পণ্য ও যাত্রীবাহী রেলশকট। সেইরকম ১৮০৭ সালেই প্রথম পরীক্ষিত হয় জলপথে বাণিজ্যিক স্বার্থে দ্রুতযানের সম্ভাবনা। এর কয়েক বছরের মধ্যেই নদীতে ও উপকূল রেখা ধরে বাষ্পযান বাণিজ্যের পসরা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকে। ১৮৩৮ সালে সামুদ্রিক **স্টিমবোট সিরিয়াস** (Sirius) আঠারো দিনে আটলান্টিক অতিক্রম করে।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে সড়কপথও নতুন করে তৈরি হতে থাকে। **ম্যাক অ্যাডম** (Mc Adam) গাড়ি চলার জন্য শক্ত রাস্তা তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে ইংল্যান্ডে পরিবহন বিপ্লব এনে দিলেন। তখনও স্বয়ংক্রিয় মোটর গাড়ি আবিষ্কৃত হয়নি। ঘোড়ায় টানা ভারি গাড়িই তখন চলত। এই নতুন রাস্তাকে বলা হত **ম্যাকাড্যামাইজড্ রোড** (macadamised road)। দেখা গিয়েছিল যে এই রাস্তা তৈরির পর একঘণ্টায় ১৪ মাইল যাওয়া সম্ভব হল।

পরিবহনের সঙ্গে তাল দিয়ে অন্য দূরসংযোগ ব্যবস্থাও গড়ে উঠল। ১৮৪৪ সালে আমেরিকার জনৈক গবেষক **স্যামুয়েল মোরস্** (Samuel Morse, 1791-1872) টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করলেন। এর ফলে একস্থান থেকে আরেকস্থানে তার সংযোগ করে বার্তা প্রেরণ করা সম্ভব হল। প্রথমে যে বার্তা প্রেরিত হয়েছিল তা হল এই—"কী ব্যবস্থা ঈশ্বর করেছেন?" (What hath God Wrought?") বলা হয়ে থাকে যে স্যামুয়েল মোরস্ যা করেছিলেন তা হল "মহাশূন্যতার মধ্যে কথার সেতু রচনা করা।"—"to bridge space with flying words,"। ১৮৭৬ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell, 1847-1922) টেলিফোন আবিষ্কার করলেন। এইভাবে শুরু হল দূরভাষণের যুগ। শিল্প বিপ্লব নতুন পর্যায়ে উন্নীত হল।

১.১২ শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল ও গুরুত্ব

১.১২.১ (ক) নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা (The New Factory System)

ইংল্যান্ডের শহরে ও গ্রামে যে কুটির ও গৃহশিল্প (cottage and household industries) ছিল তা আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়ে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হল। ছোট ছোট কারুশালার (Small work-shops) বদলে স্থাপিত হল বড় বড় যন্ত্রদ্বারা চালিত মিল (Mill)। ধনী ব্যক্তিরা দুটি জিনিস করতে লাগল—কৃষকদের ফেলে আসা জমি ও গরীবদের পরিত্যক্ত আবাস কিনে নিয়ে সেখানে বড় বাড়ি বা আচ্ছাদন (shed) তৈরি করে যন্ত্রপাতি বসাতে শুরু করল। আর তার সাথে কিনতে লাগল নতুন নতুন কল। কল চালানোর জন্য চাই মানুষ। অতএব এই কলকারখানায় নতুন শ্রমিক নিযুক্ত হতে লাগল। গ্রাম থেকে মানুষ উজাড় করে এল শহরে, ভিড় করতে লাগল কল-কারখানার চারপাশে, আর তার ফলে ঘিঞ্জি জনবসতি বস্তির রূপ নিল। স্বল্প মজুরি দিয়ে মজুরদের শ্রমকে শুষে নিতে লাগল ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা অতিকায় কল-কারখানা ব্যবস্থা। অথচ গ্রামের জীবিকাহীন কৃষক আর ভুখা মানুষদের শহরে যাবার প্রলোভনকে স্থগিত রাখার মতো কোন ব্যবস্থা আর কৃষিজগতে রইল না। সনাতন গিল্ড (Guild) ব্যবস্থা ভেঙে গেল। ছোট ছোট শহর প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। যে শহরে কলকারখানা বেশি ছিল সেখানে মানুষের ভিড় বাড়ল, যেখানে শহরের আয়তন বৃদ্ধি পেল আর সেখানেই মানুষের জীবনমান ক্রমশ নিম্নাভিমুখী হতে লাগল। এদিকে যাদের হাতে পুঁজি ছিল তারা পুঁজির আরও বিনিয়োগ ঘটিয়ে মুনাফা করতে লাগল। যন্ত্র আর পুঁজি হাত ধরাধরি করে চলল। নগরায়ণের অপ্রতিরোধ্য প্রসারের মুখে তলিয়ে যেতে লাগল সরল গ্রাম্যজীবনের ধারা।

মনে রাখতে হবে যে ১৮০০ সালের আগে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চালু হয়নি। ফলে নগরায়ণের বিস্ফারিত আত্মবিস্তার তখনও ঘটেনি। তার আগে যে সব যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছিল যেমন মাকু এবং জেনি (shuttles and spinning jennies)। তাদের গার্হস্থ্য শ্রম ও গার্হস্থ্য পরিবেশে চালনা করা যেত। ছোট কারখানা, কারুশালা সবই ছিল তখন পর্যন্ত গার্হস্থ্য ব্যবস্থার অঙ্গ। ফলে এক স্থানে বিপুল শ্রমিকের ভিড় করার দরকার হয়নি। তখন পর্যন্ত যন্ত্রপাতি অতিশয় মূল্যবান না হওয়ার ফলে গৃহস্থ কারিগররা বা সামান্য পুঁজির মালিকরা তা কিনতে পারত এবং পারিবারিক কাঠামোর বহির্ভূত ভাবার কোন অবকাশ ছিল না।

এই পরিবেশ বদলে যেতে লাগল ১৯ শতকের প্রতম সিকিভাগ সময়ের মধ্যে। ১৮৩০-এর পর যখন বাষ্প শক্তিকে উৎপাদন থেকে পরিবহনে ব্যবহার করার উদ্যোগ আরম্ভ হল তখন থেকে যন্ত্রায়নের (mechanization) প্রভাব বাড়তে লাগল। ডেভিড টমসন লিখেছেন যে যন্ত্রায়িত শিল্প আনল নগরায়ণ ও নগরকেন্দ্রিকতা (urbanism)। প্রথমে বস্ত্রশিল্পে এবং পরে কয়লা লোহা ইস্পাত এই ভারী শিল্পে আসল নগর কেন্দ্রিকতা। নতুন যন্ত্র আর নগর-মুখিনতা, নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা ও নগরায়ণ হয়ে দাঁড়াল নতুন সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য ঘটনা। ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা মানুষের সৃষ্ট ব্যবস্থা। কিন্তু শেষে তা হয়ে দাঁড়াল অতিকায় এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি, অমোঘ ভাবে স্থিতি সংহারক, নিরন্তরভাবে পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দেওয়া সভ্যতার নেপথ্যচারী শক্তি।

১.১২.২ নিঃস্ব মানুষের আবির্ভাব ও সমাজতন্ত্রের জন্ম (The coming of destitute humanly and the birth of socialism)

নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থায় দরকার হল নতুন শ্রমিকের। গ্রাম থেকে উজাড় করে আসা মানুষ হল এই শ্রমিক। তারা মূলত অদক্ষ শ্রমিক। ফলে তাদের মজুরি ছিল কম, তাদের খাটতে হত অনেক বেশি সময়, তাদের থাকার বাড়িঘর ছিল না, তাদের দিনযাপন ছিল নিঃস্বতম মানুষের মতো। ফলে তাদের সাথে তাদের পরিবার—নারী ও শিশুও দিনরাত মিল আর ফ্যাক্টরিতে খেটে যেত। পুরুষ শ্রমিক থেকে নারী ও শিশুর মজুরি ছিল আরও কম। যারা পুরানো দিনের গার্হস্থ্য কারিগরি ও হাতযন্ত্রে দক্ষ শ্রমিক ছিল তারা তলিয়ে গেল। ডেভিড টমসন লিখেছেন—'In over crowded homes in drab factory towns lived thousand of families, overworked and underpaid, creating a new social problem of immense proportions নিরানন্দময় শিল্প শহরগুলিতে অতিজনাকীর্ণ ঘরে থাকত হাজার হাজার পরিবার। ক্ষমতার অতিরিক্ত শ্রমে ক্লান্ত প্রাপ্য থেকে অনেক কম পারিশ্রমিকে বঞ্চিত এই শ্রমিকেরা এক নতুন বিশাল সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। শ্রমিকদের যখন এই রকম নাভিশ্বাস উঠছিল তখন তাদের নিয়োগকারী মালিকরা কী করছিল? ডেভিড টমসন লিখলেন—Their employers, engaged in fierce competition with rival firms and uncontrolled by any effection legislation, forced conditions of work and wages down to the lowest possible level. Economic life took on a ruthlessness, a spirit of inhumanity and fatalism, that it had not known before—শ্রমিকদের নিয়োগকারী মালিকরা প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলির সঙ্গে হিংস্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত। কোন কার্যকারী আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না থেকে তারা জবরদস্ত কাজের শর্ত আরোপ করত আর মজুরিকে নামিয়ে নিত তলানিতে। অর্থনৈতিক জীবন এক অমানবিক নির্মমতা গ্রাস করছিল। ভাগ্যের কাছে মানুষ এমনভাবে আত্মসমর্পণ করছিল যা আগে আর দেখা যায়নি। শিল্প-বিপ্লবের ফলে যখন মানব-জীবনের অবনতি ঘটতে লাগল, সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে অসহায়তা ও ক্ষোভ বাড়তে লাগল তখন স্বাভাবিকভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কিছু তীক্ষ্ণধী মানুষ প্রশ্ন করতে লাগলেন শিল্পায়নের নেতিবাচক ফল—দারিদ্র্য, জীবনমানের অবনতি, অপরিকল্পিত ঘিঞ্জি বসতি, স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব ইত্যাদি। তবে যন্ত্রলব্ধ আরামের জন্য শিল্পায়নকে মানুষ কি সত্যি সত্যি আশীর্বাদ বলে ধরে নেবে? তাঁরা দেখালেন যে শিল্পায়নের ফলে কিছু মানুষ ধনী হচ্ছে আর অধিকাংশ মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে। শিল্পায়নের সূত্র ধরে উৎপাদন ও পরিবহনের ক্ষমতা যত বাড়ছে ততই বাজার আর কাঁচামালের জন্য হিংস্র লড়াই আরম্ভ হচ্ছে, ততই শ্রমিকরা পণ্যে পরিণত হচ্ছে, সব হারিয়ে তারা নিজেদের শ্রমটুকু বিক্রী করে অসহায় পশুর মতো দিনযাপন করছে। রবার্ট ওয়েন (Robert Owen 1711-1858), কাউন্ট সাঁ-সাইমঁ (Count Saint-Simon 1730-1825), এফ. এম. সি. ফুরিয়ার (F.M.C. Fourier 1772-1837), লুই ব্লাঁ (Louis Blance, 1811-82) ইত্যাদি বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক স্বার্থের সমাজ উন্নয়নের ও ধনবৈষম্য হ্রাস করার জন্য সরকারের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এমনকী শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের প্রতিবাদ ও সংগঠনের কর্মসূচি কী হওয়া প্রয়োজন তাও তাঁরা লিপিবদ্ধ করলেন এবং বাস্তবে প্রচার করার চেষ্টা করলেন। মুনাফালোভী মুষ্টিমেয়র স্বার্থ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে, পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ থেকে সমাজের নিয়ন্ত্রণে সমস্ত মৌল হাতিয়ারগুলোকে এনে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ

কল্যাণের আদর্শ এইভাবে আত্মপ্রকাশ করল। সমাজ-কল্যাণের এই দর্শনই হল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের দর্শন সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক রূপ লাভ করে **কার্ল মার্ক্স** (Karl Marx, 1818-83) এবং **ফ্রিড্‌রিশ এঙ্গেলস্**-এর (Friedrich Engels 1820-95) হাতে। কার্ল মার্ক্স তাঁর **ডাস ক্যাপিটাল** (Das Capital) এবং **কমিউনিস্ট ইস্তাহার** (Communist Manifesto) গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে এযাবৎকালের সমস্ত প্রচলিত সমাজের ইতিহাসই হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। তাই তিনি ডাক দিয়েছিলেন 'বিশ্বের শ্রমিক এক হও'। এই ডাকের সাড়ায় বিশ্বময় শ্রমিক জেগে উঠেছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিনের (Lenin) নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লব (Bolshevik Revolution) এই জেগে ওঠারই পরিণতি।

১.১২.৩ শিল্প-বিপ্লব কি সমাজ বিবর্তনে ছেদ এনেছিল?

ইউরোপের ফনটানা অর্থনৈতিক ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডে (The Fontana Economic History of Europe, Vol.3) ঐতিহাসিক কার্লো এম. চিপোলা (Carlo M. Cipolla—তিনিই এই ফনটানা সিরিজের সাধারণ সম্পাদক) লিখেছেন যে নতুন প্রস্তর যুগের বিপ্লবের পর শিল্প-বিপ্লব ছাড়া আর কোন বিপ্লব নাটকীয়ভাবে এতখানি বৈপ্লবিক ছিল না (....no revolution has been as dramatically revolution as the industrial Revolution except perhaps the Neolithic Revolution.") এই দুই বিপ্লবই ঐতিহাসিক চিপোলার মতে, ইতিহাসের ধারাবাহিক বিবর্তনে ছেদ টেনেছে, ইতিহাসের গতিকে আমূল বদলে দিয়েছে। চিপোলা লিখলেন—"Both these changed the curse of history, so to speak, each one bringing about a discontinuity in the historic process" এক সময়ে মানুষ ছিল বন্যপশু শিকারী, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। যাদের জীবন বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক হবসের (Hobbes) ভাষায় ছিল 'নিঃসঙ্গ, হীন, নোংরা, হিংস্র ও সংক্ষিপ্ত' ('solitary, poor, nasty, brutish and short')। নব্যপ্রস্তর যুগ (Neolithic age) আসার পর সেই মানুষ স্থিতিশীল হল, কৃষিকাজ শিখল, সমাজ গড়ল এবং কৃষি নির্ভর সভ্যতার সূচনা করল। মানুষের এই কৃষক-রাখাল সভ্যতার থেকে তাকে বের করে আনল শিল্প-বিপ্লব। তাকে করল নৈর্ব্যক্তিক শক্তির দ্বারা চালিত যন্ত্রের পরিচালক—The Industrial Revolution transformed man from a farmer-shepherd into a manipulator of machines worked by inanimate energy (Cipolla). প্রথমে বাষ্প, তারপর কয়লা, আরও পরে বিদ্যুৎ এবং শেষ পর্যন্ত আনবিক শক্তি ও খনিজ তেলকে কাজে লাগিয়ে মানুষ সভ্যতার চরিত্র ও গতিকে এমনভাবে বদলে দিয়েছিল যে ১৮ ও ১৯ শতক পূর্বাপর ইতিহাসের এক বৈপ্লবিক ছেদবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে মানুষ শুধু জ্বালানি হিসাবে কাঠ ও উত্তোলক শক্তি হিসাবে পেশীশক্তিকে ব্যবহার করতে জানত শিল্প-বিপ্লব তার হাতে এনে দিল শুধু জ্বালানি কাঠ, কয়লা, তেল—নয়, আরও বড় শক্তি তা হল বিদ্যুৎ। অতীতের সঙ্গে এর যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া ভার।

আসলে এই 'হঠাৎ পরিবর্তন'—sudden transformation-এর যে ধারণা তা আরনল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee) লেখা থেকেই মানুষ ধারণা করেছিল। আজকাল ঐতিহাসিকরা একটু ভিন্ন করে ব্যাপারটি বুঝবার চেষ্টা করেছে। টয়েনবি বলেছেন যে মধ্যযুগের শিল্প জীবনের যে কাঠামো ধীরে ধীরে ভাঙছিল তা অকস্মাৎ বাষ্প-ইঞ্জিন ও শক্তি-চালিত তাঁতযন্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হয়ে গেল—"The slowly dissolving framework of medieval industrial life...was suddenly broken in pieces by the mighty blows of steam engine and the power loom," এ মতকে পাশ কাটিয়ে আধুনিক গবেষকরা বলেন যে

শিল্প-বিপ্লবের একটা প্রস্তুতি দীর্ঘকাল ধরে লোকচক্ষুর আড়ালে একটু একটু করে গড়ে উঠছিল। **ফিলিস ডিন** বলেছেন যে শিল্প-বিপ্লব এসেছিল অন্য নানা বিপ্লবের সংসর্গে, ফলে তার হঠাৎ অভ্যুদয় সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক **নেফ** (Nef) বললেন যে গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পভাব ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হবে যে তা ষোড়শ শতক থেকে আরম্ভ হয়ে উনিশ শতক পর্যন্ত চলেছিল। অর্থাৎ তিন শতকের ধারাবাহিক কোন ঘটনা পূর্বাপর সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে না। **হার্বার্ট হিটন** (Herbert Heaton) বলেছেন যে টয়েনবির যুগে ১৭৬০-এর আগের ও পরের অধ্যায়কে যত স্পষ্ট করে বোঝা গিয়েছিল তার থেকে আজকাল বৃহত্তর গবেষণার মধ্য দিয়ে আরও স্পষ্ট করে বোঝা যায়। এখন আমরা জানতে পেরেছি যে শিল্প-বিপ্লব হঠাৎ একটা অপরিবর্তনশীল জগৎকে ভেঙে দেয়নি। হঠাৎ সনাতন জগতের পুঁজিবাদী ছোট ছোট উৎপাদন-এককের উপর তা আছড়ে পড়েনি, পরিবর্তনের গতিকে অস্বাভাবিক দ্রুতও করতে পারেনি, আর এমন কথাও ঠিক নয় যে ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে সামাজিক অর্থনৈতিক দুঃসহ জীবনের ছবিই সমস্ত প্রেক্ষা জুড়েছিল।

মনে রাখতে হবে যে শিল্প-বিপ্লব এতটাই ধারাবাহিক যে আজকাল ঐতিহাসিকরা একটার জায়গায় দুটো শিল্প-বিপ্লবের কথা বলেন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে ১৮৭০এর দশকে শুরুতে শেষ হয়ে যায় 'প্রথম বিপ্লব' (The First Revolution) যা আঠারো শতকের মাঝামাঝি শুরু হয়েছিল। এই বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল ১৮৩০ থেকে ১৮৭১ সাল। এরপর যে অধ্যায় আরম্ভ হল তা শিল্প-বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায়। মিকিনের (Meakin) ভাষায় 'নতুন শিল্প-বিপ্লব' (The New Industrial Revolution), আর জিভনস্-এর (Jevons) ভাষায় 'দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব' (The second Industrial Revolution)। ১৮৭১ থেকে আজ পর্যন্ত শিল্প-বিপ্লবের একটা নতুন ধারা শুরু হয়েছে যেখানে আমেরিকা, জার্মানি ও জাপানের মতো দেশ নতুন বৈজ্ঞানিককে হাতিয়ার করে বিপ্লবের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। আনবিক শক্তির উপর দখল এনে মানুষ এত দ্রুত পরিবর্তনের গতিকে বদলে দিচ্ছে যে তার সাথে তাল রেখে অগ্রসর হওয়া অনেক দেশের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তা বলে একে অতীতের সাথে যোগশূন্য বলে ভাবা যাবে না। ইতিহাসে সব কিছুর পরম্পরা আছে। শিল্প-বিপ্লব এই পরম্পরার বাইরে নয়। সভ্যতার ধারাবাহিকতা নিরন্তর ও অবিচ্ছিন্ন।

১.১৩ সারাংশ

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে আত্মপ্রকাশ করে দুশো বছরের অধিক সময় ধরে যে বিপ্লব পৃথিবীতে চালু রয়েছে তার কোন অতর্কিত উদ্ভব ঘটতে পারে না। শিল্প-বিপ্লবের আত্মপ্রকাশের কোন অধ্যায়ের দ্রুততা থাকতে পারে কিন্তু তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। টয়েনবি বা চিপোলার মতো ঐতিহাসিকরা এই বিপ্লবের স্বতঃস্ফূর্ততায় এতবেশি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাকে পূর্বাপর ইতিহাসের মধ্যে একটি 'ছেদ' (Break) বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। আসলে যা হয়েছিল তা এই। প্রায় ষোড়শ শতাব্দী থেকে একটা সমাজ পরিবর্তনের ফল্গু ধারা জনমানসের পরিবর্তন আনছিল। পুঁজির নতুন সঞ্চয়ে সাহায্য করছিল বহির্বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ গিল্ডগুলি (Guild) আর শ্রম সংগঠনে সাহায্য করতে পারছিল না, গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের কাঠামো জীর্ণ হলে জীবিকাচ্যুত অনেক মানুষ শহরে আসছিল। তা সত্ত্বেও জনসংখ্যা কম থাকায় নতুন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিকের যোগান যথেষ্ট ছিল না। ঠিক এই সময় থেকে আসতে শুরু করল বিদেশী বাজারের চাহিদা, মানুষ ঝুঁকে পড়ল যন্ত্র তৈরির দিকে।

এই সময় থেকে পেশীশক্তির সীমা বোঝা যেতে লাগল। মানুষ অনুভব করল যে জল ও বায়ুশক্তিও অনিশ্চিত এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই। তখনই মানুষ জানতে পারল যে বাষ্পের মধ্যে শক্তি অনড়কে সচল করার ক্ষমতা রাখে। আবিষ্কৃত হল বাষ্পীয় ইঞ্জিন। বাষ্পশক্তির চাপকে দিনের পর দিন সহ্য করার মতো ক্ষমতা কাঠের ছিল না। তাছাড়া কাঠের স্থিতিস্থাপকতা থাকলেও তা পচনশীল ছিল। তাই ব্যবহৃত হতে লাগল লোহা আর লোহার পাটাতন। লোহা গলিয়ে তৈরি হল ইস্পাত। এইবার হল জ্বালানির ও শক্তির বিকল্প সন্ধান। কাঠ ও কাঠ-কয়লার স্থানে এল খনি থেকে আহৃত কয়লা। লোহা আর কয়লার ভাণ্ডার যে দেশের আছে সেই দেশ—ইংল্যান্ড—সহজেই হয়ে উঠল পৃথিবীর প্রথম শিল্প-বিপ্লবের দেশ। হল্যান্ডের ও ফ্রান্সের মজুত শক্তি ইংল্যান্ডের সমান ছিল না। তাছাড়া ফ্রান্সের জনশক্তি অনেক বেশি ছিল ফলে শ্রমের যোগান ছিল প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই কারণেই যন্ত্রের প্রয়োজন ইংল্যান্ডে যেভাবে অনুভূত হয়েছিল ফ্রান্সে হয়নি।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে শিল্পায়িত দেশগুলিতে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। শ্রমিকরা নিষ্পেষিত হচ্ছিল বেশি কাজ, কম মজুরি আর বিরতিহীন একঘেয়েমির জাঁতাকলে। নারীরা কোথাও কোথাও তলিয়ে যাচ্ছিল অন্ধ কলকারখানার শ্রমিক হিসাবে। বিবাহিত নারীরা নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল তাদের স্বামীদের উপার্জনের উপর। আর পরিবারের পর পরিবার শ্রমিক বসতির ঘিঞ্জি পরিবেশে জীবনমানের অবনতি ঘটিয়ে মানবসম্পদের অবক্ষয় ঘটাতে লাগল। এর প্রতিবাদে জেগে উঠল সমাজতন্ত্রের দর্শন।

এইভাবে সমাজের ছবি হয়ে দাঁড়াল দুই বিপরীতের সমাবেশ। একদিকে শ্রমক্লান্ত খেটে খাওয়া মানুষ আর অন্য দিকে মুনাফায় স্ফীত হওয়া ধনিক গোষ্ঠী, যারা পুঁজিপতিরূপে উৎপাদনের চাবুক নিজেদের হাতে রাখত। কার্ল মার্ক্স এদেরই বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়াট বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এই দুই বিরোধী মানুষের শ্রেণীদ্বন্দ্ব শিল্প-বিপ্লবের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ঘটনা। একসময় মনে করা হত যে শিল্প-বিপ্লবে সরকারের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় দর্শকের। একথা বলার পেছনে বিশ্বাস ছিল যে সমস্ত উদ্যোগই ছিল বেসরকারি উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত পুঁজির ঘনীভবন সম্ভব হয়েছিল এ কথা অনেকদিন বলা হয়নি—আর বলা হয়নি কারণ অনেকদিন ধরেই জনমানসে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে দেশের উন্নতি ঘটেছে অবাধ বাণিজ্যের (free trade) ফলে। কারণ অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) বুঝিয়েছিলেন যে অর্থনীতির পেছনে এক 'অদৃশ্য হাত' (invisible hand) কাজ করে। ফিলিস ডিনের মতন গবেষকরা দেখিয়েছেন যে শিল্প-বিপ্লবের পেছনে অদৃশ্য পরিচালকের হাত অনেক সময়ে দৃশ্যমান ছিল। সরকার একের পর এক শিল্প ও পুঁজি বিনিয়োগ সংক্রান্ত এমন সব আইন খারিজ করে যে আইনগুলি না বাতিল হলে শিল্পায়নের প্রতিবন্ধকতার অবসান হত না। তাছাড়া উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে সরকার অনেকবার প্রত্যক্ষভাবে অর্থনীতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছিল যা শিল্প-বিপ্লবের সহায়ক হয়েছিল। ইংল্যান্ডের সরকার উদাসীন, অনড় ও নিষ্ক্রিয় হলে শিল্প-বিপ্লব হত না।

পরিশেষে একথা মনে রাখতে হবে যে শিল্প-বিপ্লব মোট ছয়টি বড় শিল্প-পরিবর্তনকে বোঝাত। (এক) কয়লা, বিদ্যুৎ, খনিজ তেল, গ্যাস ইত্যাদির আবিষ্কার ও ব্যবহারের ফলে জ্বালানি ও শক্তির নতুন সৃষ্টি জনিত শিল্প-পরিবর্তন, (দুই) লোহা গলানোর দ্বারা মূল আকর থেকে ধাতুকে পৃথক করা (smelting) এবং লোহাকে গলিয়ে তাকে পেটাই করার (iron-founding—এইরূপ কারখানার নাম iron-foundry) ফলে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পব্যবস্থার উত্থান, (তিন) বাষ্পকে ব্যবহার এমন শক্তির সঞ্চার করা যার দ্বারা অনড়বস্তু সচল হয়—অর্থাৎ

স্থান থেকে স্থানান্তর পরিবহনের ব্যবস্থা হয়। যার থেকে জন্ম হয় পাম্প ও পরিবহন শিল্পের, (চার) বস্ত্রশিল্পের নতুন উদ্ভাবন-জনিত উন্নয়ন এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাসায়নিক শিল্পের (industrial chemistry) আবির্ভাব। কাপড়ের নির্মলকরণ (Bleaching), কাপড়কে রাঙানো (Dyeing), কাপড় ছাপানো (printing) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নতুন রসায়ন-শিল্পের উদ্ভব; (পাঁচ) ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার আবির্ভাব ও (ছয়) সরকারের ভূমিকার পরিবর্তন ও সমাজে যুগপরিবর্তনের মনস্কতা তৈরি হওয়া।

শিল্প-বিপ্লব একটি সামগ্রিক ঘটনা। তাকে খণ্ড করে ভাবা যাবে না।

১.১৪ অনুশীলনী

১. নীচের বক্তব্যগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল তা [✓] এবং [x] এই দুই চিহ্নের সাহায্যে উত্তর দিন।

(ক) ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লব সমসাময়িক ঘটনা। [ ]

(খ) শিল্প-বিপ্লবের অর্থ হল প্রযুক্তিতে বিজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োগ। [ ]

(গ) শিল্প-বিপ্লবে যে জ্বালানি (fuel) ও উদ্দীপক শক্তির (energy) ব্যবহার বেশি হয়েছিল তা হল কয়লা, খনিজ তেল, বিদ্যুৎ ও আনবিক শক্তি। [ ]

(ঘ) শিল্প-বিপ্লবের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল লোহা, কয়লা ও বাষ্পশক্তির ব্যবহার। [ ]

(ঙ) শিল্প-বিপ্লবের একটি অনিবার্য দান হল ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পের আবির্ভাব। [ ]

(চ) শিল্প-বিপ্লব শুধু শিল্পে এসেছিল, কৃষিতে নয়। [ ]

(ছ) শিল্প-বিপ্লব নতুন গতি এনেছিল কিন্তু পুরানো নীতিকে বদলায়নি। [ ]

(জ) ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবে সরকার কোন ভূমিকা গ্রহণ করেনি। [ ]

(ঝ) সমাজতন্ত্র শিল্প-বিপ্লবের দান। [ ]

(ঞ) বাষ্পশক্তির ঠেলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল। শিল্প-বিপ্লবে এই ক্ষমতার ব্যবহার হয়েছিল। [ ]

(ট) ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে শিল্প-বিপ্লবের প্রাথমিক সূচনা হয়েছিল। [ ]

(ঠ) ১৭৮৩ থেকে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ হল অধ্যাপক রস্টোর মতে 'আধুনিক সমাজগুলির জীবনে বড় জলবিভাজিকা'। [ ]

(ড) কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন যে শিল্প-বিপ্লবের আদি সীমা ষোড়শ শতাব্দী। [ ]

(ঢ) সপ্তদশ শতাব্দীতে আমস্টার্ডম বিশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্র হয়েছিল। [ ]

(ণ) শিল্প-বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সের জনসংখ্যা ইংল্যান্ডের জনসংখ্যার চেয়ে কম ছিল না। [ ]

(ত) শিল্প-বিপ্লবের সূচনা কালে ফ্রান্সের জনসংখ্যা এত বেশি ছিল যে তা শিল্প-বিপ্লবের সহায়ক ছিল না। [ ]

(থ) শিল্প-বিপ্লবের সময়ে ইংল্যান্ডে 'কৃষি-বিপ্লব' বা 'যানবাহন বিপ্লব' ঘটেনি। [ ]

(দ) কয়লা ছিল ইংল্যান্ডের 'সবচেয়ে সস্তা শক্তির মৌল উপাদান'। [ ]

(ধ) 'যন্ত্রায়িত কারখানা ব্যবস্থা' প্রাক-শিল্প-বিপ্লব ঘটনা। [ ]

(ন) জনশক্তির অভাব, জনমনের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা গভীরভাবে ইংল্যান্ডের শিল্পায়নের পশ্চাৎ শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। [ ]

(প) জেথরো টুল ওয়াটার ফ্রেম আবিষ্কার করেন। [ ]

(ফ) রিচার্ড আর্করাইট স্পিনিং মিউল আবিষ্কার করেন। [ ]

(ব) জন কে 'উড়ন্ত মাকু' আবিষ্কার করেন। [ ]

(ভ) জেমস ওয়াট বাষ্প ইঞ্জিন বা বাষ্প পোত আবিষ্কার করেন। [ ]

(ম) রবার্ট ফুলটন বাষ্প-নাও আবিষ্কার করেন। [ ]

২। তিনটি বাক্যে উত্তর দিন

(ক) লোহা আর কয়লার সহযোগে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা কীভাবে হয়েছিল?

(খ) তিনটি উদাহরণ দিয়ে যন্ত্রায়িত উৎপাদনের ব্যাখ্যা দিন।

(গ) শিল্প-বিপ্লবের যে কোন তিনটি নতুন আবিষ্কারের উল্লেখ করুন।

(ঘ) শিল্প-বিপ্লবে নতুন সঞ্চার অর্থাৎ গতি, নতুন ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ নয়া নীতি এবং নতুন সংযোগ অর্থাৎ পরস্পর নির্ভরতার যে পরিবেশ তৈরি করেছিল তার স্বরূপ লিখুন।

(ঙ) শিল্প-বিপ্লবে সরকারের কী ভূমিকা ছিল?

(চ) ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা কী?

(ছ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর যে আবির্ভাব ঘটল তার প্রেক্ষিত কী?

(জ) শিল্প-বিপ্লব বস্ত্র-শিল্পের নতুন উদ্ভাবন কী হয়েছিল?

(ঝ) শিল্প-বিপ্লবে বাষ্প শক্তিকে কীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল?

(ঞ) শিল্প-বিপ্লবের সংজ্ঞা কী?

(ট) আরনল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee) কে? তাঁর বক্তব্য কী?

(ঠ) 'প্রতিপালিত উন্নয়নের ভিতর উড়ান' কী?

(ড) ফিলিস ডিন-এর বক্তব্য কী?

(ঢ) অধ্যাপক রস্টো-র তত্ত্ব কী?

(ণ) অধ্যাপক নেফ-এর মত কী?

(ত) কেন পর্তুগাল ও স্পেন শিল্প-বিপ্লবে অগ্রণী হতে পারল না?

(থ) অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্য কেন বহির্বাণিজ্য ও শিল্প-বিপ্লবে অগ্রণী হতে পারল না?

(দ) ফ্রান্স কেন ইংল্যান্ডকে অতিক্রম করে প্রথম শিল্প-বিপ্লবের দেশ হতে পারল না?

(ধ) ফ্রান্সের জনসংখ্যা কী তার দেশে শিল্প-বিপ্লবের অন্তরায় ছিল?

(ন) লোহা শিল্পের অগ্রগতি ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম বনিয়াদ—ব্যাখ্যা করুন।

(প) ইংল্যান্ড বিশ্ববাজারের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিল একমাত্র উৎপাদক জাতি হিসাবে—ব্যাখ্যা করুন।

(ফ) শিল্পায়নের দুটি পর্ব কী?

(ব) শিল্প-বিপ্লব কী ধারাবাহিক ভাবে একটি বিপ্লব?

(ভ) 'স্পিনিং জেনি' কী?

(ম) ইউরোপে যে খনিরেখা ধরে জনবন্ধনী গড়ে উঠেছিল তা বর্ণনা করুন।

(য) 'জেথরো টুল' কে?

(র) হকাম-নিবাসী কোক কী করেছিলেন?

(ল) শিল্প-বিপ্লবের ক্ষেত্রে রবার্ট বেকওয়েল বিখ্যাত কেন?

(ব) স্যামুয়েল ক্রম্পটন কী আবিষ্কার করেছিলেন?

(শ) 'স্পিনিং মিউল' কী?

৩। দশটি বাক্যে উত্তর দিন

(ক) শিল্প-বিপ্লব কী সমাজ বিবর্তনে কোন ছেদ এনেছিল?

(খ) কার্লো এম. চিপোলা কে? শিল্প-বিপ্লবের গুরুত্ব সম্বন্ধে তার মত কী?

(গ) শিল্প-বিপ্লব কী কোন হঠাৎ পরিবর্তন? এ বিষয়ে ফিলিস ডিন ও হার্বাট হিটনের মত কী?

(ঘ) সমাজতন্ত্রের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল?

(ঙ) সমাজতন্ত্রের চারজন দার্শনিকের নাম লিখুন ও তাদের দর্শন আলোচনা করুন।

(চ) নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

(ছ) পরিবহন বিপ্লবের একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করুন।

(জ) শিল্প-বিপ্লব কৃষিতে কী পরিবর্তন এনেছিল?

(ঝ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে বস্ত্রশিল্পের কী উন্নতি হয়েছিল?

(ঞ) রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানিতে কেন পরে শিল্প-বিপ্লব হয়েছিল?

(ট) শিল্প-বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করন।

(ঠ) শিল্প-বিপ্লব নিয়ে হবসবম ও ডেভিড টমসনের মতামত আলোচনা করুন।

(ড) সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্ববাণিজ্য ও বিশ্ববাজার—এই তিনের সঙ্গে শিল্প-বিপ্লবের কি কোন যোগ আছে?

(ঢ) "তবুও ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হল না হল— ইংল্যান্ডে"—ব্যাখ্যা করুন।

(ণ) অধ্যাপক হফ্‌ম্যান, অধ্যাপক রস্টো এবং অধ্যাপক নেফ-এর মতামত আলোচনা করুন।

(ত) শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল কী হয়েছিল?

(থ) "পরিশেষে বলতে হবে যে শিল্প-বিপ্লব ছয়টি বড় শিল্প পরিবর্তনকে বোঝাত।" এই ছয়টি পরিবর্তন বর্ণনা করুন।

(দ) জেমস ওয়াট, জর্জ স্টিফেনসন ও রবার্ট ফুলটন—এই তিনজনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(ধ) শিল্প-বিপ্লবে পেশীশক্তির বিকল্প শক্তি কী এসেছিল? তার দ্বারা শিল্প-বিপ্লব কীভাবে ত্বরান্বিত হল?

(ন) "মনে রাখতে হবে যে শিল্প-বিপ্লব এতটাই ধারাবাহিক যে আজকাল ঐতিহাসিকরা একটার জায়গায় দুটো শিল্প-বিপ্লবের কথা বলেন"—ব্যাখ্যা করুন।

(প) 'দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব' বলতে কী বোঝায়?

(ফ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে কোন শ্রেণী লাভবান হয়েছিল? কোন শ্রেণীই বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল?

(ব) নতুন শিল্প-বিপ্লব কাকে বলে?

(ভ) "ইতিহাসে সবকিছুর পরম্পরা আছে। শিল্প-বিপ্লব এই পরম্পরার বাইরে নয়"—বুঝিয়ে বলুন।

৪। শূন্যস্থান পূরণ করুন

(ক) "প্রযুক্তিকে —— আবিষ্কার করা হচ্ছিল নতুন যন্ত্র ও নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা।"

(খ) "এবার এই কৃষি অর্থনীতির পাশে আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল একটি আধুনিক অর্থনীতি ——"

(গ) "এর সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করেছিল ———, সূচিত হয়েছিল নতুন শ্রমিক আন্দোলনের"।

(ঘ) "শিল্পের চালিকা শক্তি হিসাবে পেশীশক্তির বিকল্পে দেখা দিল প্রথমে — এবং পরে — "।

(ঙ) "আত্মপ্রকাশ করল নিম্নগামী জীবনে ——— প্রলেটারিয়েট"।

(চ) কিন্তু যিনি প্রথম 'শিল্প-বিপ্লব' ('Industrial Revolution') শব্দ দুটি একটি অতিদ্রুত বিশেষ অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচকরূপে বর্ণনা করেছিলেন তাঁরা হলেন ———।

(ছ) "তাঁর (অধ্যাপক নেফ) মতে রানি প্রথম এলিজাবেথের সময়ে যে —— গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল ——।"

(জ) "এই সময়ের মধ্যেই সুনিশ্চিত ——————— take off into sustained growth' হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন।"

(ঝ) "এইবার ওলন্দাজদের অনুকরণ করতে লাগল —— আঠারো শতকে তারাই হয়ে উঠল প্রধান"।

(ঞ) "বিশ্ববাণিজ্য একটি দেশকে দেয় কাঁচামালের সংস্থান, বাজার ——— ও —— আর দেয় তার নিজের সমাজের মানুষদের এক বড় —, — —।"

(ট) "তবুও ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হল না, — —।"

(ঠ) "৪০০ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং-এর (ইংরাজি পরিভাষায় £ 40 million) মূল্যের আমদানির রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য — — — ছিল — — অধিবাসী।"

(ড) "ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবে আত্মপ্রকাশ করার আরও একটা বড় কারণ হল — — — ও — — অগ্রগতি"।

(ঢ) "— বলা হত গলানোর জন্য প্রয়োজনীয় 'সবচেয়ে সস্তা শক্তির মৌল উপাদান।"

(ণ) "ব্রিটেনের মধ্য অভ্যন্তরের দেশগুলিতে, —, — প্রভৃতি দেশে পেরেক, —, —, —, — চামচ, হাতা, পাত্র ইত্যাদি ছোট ধাতব অস্ত্রের ও দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী তৈরির কারুশালা গড়ে উঠল।"

(ত) "এখানে মনে রাখতে হবে যে — সাল — থেকে — সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত মহাদেশীয় যুদ্ধগুলিই ছিল — — ইঙ্গ ফরাসী লড়াই।"

(থ) "প্রাক-শিল্পায়িত সমাজে বেশির ভাগ বস্তু উৎপন্ন হত — —, ছোট —, বা কারুশালায়।"

(দ) "জলকে বাষ্পীভূত করতে হলে চাই জ্বালানি —।"

(ধ) "রাশিয়াতে — সালে মোট জনসংখ্যার ছিল— বা — —।"

(ন) "— সালে জেথরো — গভীরভাবে মাটি খননের একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন।"

(প) "— — সরলরেখায় মাটি কেটে সারিবদ্ধভাবে বীজধান উৎপাদনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করলেন।"

(ফ) "আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে — — (১৭২৫-১৭৯৫) গার্হস্থ্য পশু প্রজনন ও — — নতুন পদ্ধতি প্রচলন করেন।"

(ব) "তাঁত বোনায় বিপ্লব এনেছিলেন — সাল — —।"

(ভ) "... ১৭৭৯ সালে ... — — স্পিনিং মিউল নামে নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন।"

(ম) "১৭৩৮ সালে — — — মাকু আবিষ্কার করে এই সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন।"

১.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

কোন সংক্ষিপ্ত পরিসরে শিল্প-বিপ্লবের পাঠ-যোগ্য গ্রন্থতালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। আপনারা যদি শিল্প-বিপ্লবের কোন বিস্তৃত পাঠ চান তবে তিনভাগে তা করতে পারেন। প্রথমভাগে থাকবে সাধারণ পাঠ — শিল্প-বিপ্লবের সূচনা, সময়, বিস্তার সাধারণ চরিত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পাঠ। দ্বিতীয়ভাগে থাকবে অঞ্চল ভিত্তিক আলোচনা, আর তৃতীয়ভাগে শিল্প-ভিত্তিক পর্যালোচনা। পরের পাতায় আমরা গ্রন্থের তালিকা সেইভাবেই সাজিয়ে দিলাম।

সাধারণ পাঠ (General Studies)

Ashton, T.S. The Industrial Revolution 1760-1830 (rev. ed. 1968).

Clapham, J.H. An Economic History of Modern Britain vol. I (1939).

Deane, Phyllis The First Industrial Revolution, (Second ed.).

Deane Phyllis and Cole, W.A. British Economic Growth 1688-1959 (1961).

Hobsbawm, E.J. Industry and Empire : An Economic History of Britain since 1750 (1968).

The Age of Revolution : Europe 1789-1848.

Knowles, L.C.A The Industrial and Commercial Revolutions in Great Britain during the Nineteenth century (Reprint of fourth revised edn.)

সাধারণভাবে ইউরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাস পড়তে গেলে পড়তে হয় Carlo M. Cipolla (general Editor) সম্পাদিত The Fontana Economic History of Europe-এর বিভিন্ন খণ্ড। আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন এই Fontana series-এর Vol.3 এবং vol.4 বিশেষ করে তৃতীয় খণ্ডে Cipolla-র সম্পাদকীয় মন্তব্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া Encyclopaedia Britannica, Vol.6 (15th edn. Micropaedia) এবং Collier's Encyclopaedia, vol, 12 অবশ্য পঠিতব্য গ্রন্থ। একটু পুরনো হলেও কাজের বই A.P. Usher, Economic History of Europe since 1750 (1937). এর সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে অপেক্ষাকৃত পরের বই K. Polanyi, The great transformation (published as Origins of our Time in England, 1945)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিল্প-বিপ্লব নিয়ে যে গবেষণা তা পাওয়া যাবে নীচের বইগুলিতে।

C. Cipolla The Economic History of World population

Singer, Holmyard, Hall and Williams, A History of Technology, Vol.IV : The Industrial Revolution 1750-1840 (1958).

W.H. Armytage, A social History of Engineering (1961).

W.T. O'Dea The Socil History of lighting (1958).

অঞ্চল ভিত্তিক পাঠ (Regional Studies)

Dod, A.H. The Industrial Revolution in North Wales (1933).

Hamilton, H. The Industrial Revolution in Scotland (1932).

Mackenzie, K. The Banking systems of Great Britain, France, Germany and the USA (1945)

Henderson W.O. Britain and Industrial Europe 1750-1870 (1954).

The Industrial Revolution on the continent : Germany, France, Russia 1800-1914 (1961).

Goodwin A.(ed.) The European nobility in the 18th century (1953).

W . O. Henderson-এর বই দুটিতে চমৎকার পুস্তক তালিকা দেওয়া আছে। মনে রাখতে হবে যে শিল্প-বিপ্লবের উপর বই-এর সংখ্যা বিপুল। তাছাড়া ইউরোপের ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান না থাকলে শিল্প-বিপ্লব বোঝা যায় না। তাই ইউরোপের ইতিহাস পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় বইয়ের তালিকা সমেত দুটি বই আছে। তাদের নাম নীচে দেওয়া হল। প্রয়োজনে সেগুলি দেখা যেতে পারে।

J. S. Bromley and A Goodwin ed. (Oxford (1956), A Select List of Works on Europe and Europe Overseas 1715-1815.

Allan bullock and A.J.P. Taylor ed. (1957), A Select List of Books on European History 1815-1914.

শিল্প-পাঠ (Industry Studies)

Ashton, T.S. and Sykes, J., The Coal Industry of the Eighteenth Century (1959).

Colemen, D.C. The British Paper Industry 1495-1860 (1958).

Clow, A. and N.L. The Chemical Revolution (1952).

Haber, L.F. The Chemical Industry during the Nineteenth Century (1958).

Mathias, P. The Brewing Industry in England, 1700-1830 (1959).

একক ২ □ সমাজতন্ত্র

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ ফরাসী দর্শন ও সমাজতন্ত্র

২.৪ প্রথম পর্বের কল্পান্তিক সমাজতন্ত্র

২.৫ সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ের বৌদ্ধিক রচনা

২.৬ পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র : কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেলস

২.৭ দ্বান্দ্বিকতা কী?

২.৮ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

২.৯ শ্রেণী-সংগ্রাম তত্ত্ব

২.১০ ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা

২.১১ নৈরাজ্যবাদ

২.১২ সরকার ও সমাজতন্ত্রীদল

২.১৩ সারাংশ

২.১৪ অনুশীলনী

২.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন—

- শিল্প-বিপ্লব কাকে বলে, কবে এ বিপ্লব হয়েছিল, কেন হয়েছিল ও তার ফলাফল কী।
- মানব-সভ্যতায় এ বিপ্লবের স্থান কোথায়।
- কেন ইউরোপ বিগত কয়েকশো বছর ধরে পৃথিবীতে এত প্রাধান্য করছে—তার শক্তির উৎস স্থল কী।
- কেন ইংল্যান্ড শিল্পায়িত আধুনিকতায় বিশ্বে প্রথম।
- কীভাবে শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল থেকে জন্ম নিল সমাজতন্ত্রের দর্শন।

২.২ প্রস্তাবনা

সমাজতন্ত্র হল সাম্যবাদ। সামাজিক বৈষম্য ও বৈষম্য জনিত নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা থেকে জন্ম নেয় সাম্যবাদ। অতএব সাম্যবাদের ধারণা কোন নতুন ধারণা নয়। কিন্তু সাম্যবাদ যখন সমাজ-পরিবর্তনের কর্মসূচীকে গ্রহণ করে সমাজ-বিবর্তনে একটি সঙ্কল্পবদ্ধ দর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন মানুষের কিছু সমানাধিকারের মৌল আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানাতে দায়বদ্ধ হয় তখনই সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়। যে সমাজতন্ত্রকে আজকে আমরা জানি, বলা হয়ে থাকে যে তার আবির্ভাব শিল্প-বিপ্লবের সময়ে। শিল্প-বিপ্লব যখন আরম্ভ হল, যখন যন্ত্রের প্রভাব এবং প্রয়োগ বাড়তে লাগল, যখন শিল্পায়ন তার প্রারম্ভিক পর্যায় ছিল, ঠিক তখনই শিল্প-বিপ্লবের সেই অস্ফুট ঊষায় কোন কোন মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন যে এই বিপ্লবের সামাজিক ফল সবসময় মঙ্গলজনক হবে না। লাগামহীন শিল্পায়নের বিরুদ্ধে একটু একটু করে প্রতিবাদ দেখা দিতে শুরু করেছিল। কিছু চিন্তাশীল মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে শিল্পায়ন যেমন একদিকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরামের ব্যবস্থা করছে, অন্যদিকে তলিয়ে দিচ্ছে বহু মানুষকে দীনতার মধ্যে—নিঃসীম দারিদ্র্য, ক্ষয়, রোগ ও মৃত্যুর মধ্যে। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে মুষ্টিমেয় মানুষ যেমন বিপুল মুনাফা অর্জন করে স্ফীত হচ্ছে ঠিক তেমনই অসখ্য মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে সর্বহারার ভিড়ে মিশে যাচ্ছে। তারা প্রশ্ন করলেন যে ঘিঞ্জি শহর, রোগগ্রস্ত মানুষ, শোষিতের হাহাকার, ক্রমক্ষয়িষ্ণু জীবনমান এবং অপসৃয়মাণ মানবিকতা একদিকে, অন্য দিকে যন্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য ও বাণিজ্যের মুনাফা—এর কোনটি গ্রহণীয়? তাঁরা দাঁড়ালেন লাঞ্ছিত মানবতার পক্ষে, প্রতিবাদ করলেন যন্ত্রের কাছে মানুষের একতরফা বিকিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে, চাইলেন সর্বহারার পুনর্বাসন, সাম্য আর অধিকারের মধ্যে এবং ঘোষণা করলেন যে শিল্পায়নের মূল্য কখনো মানব অস্তিত্বের বলিদান হতে পারে না। শিল্প-বিপ্লবের নেতিবাচক ফলের বিরুদ্ধে এই আত্মিক জাগরণই সমাজতন্ত্র নামে বিখ্যাত।

ডেভিড থমসন (David Thompson) বলেছেন যে, ১৮৪৮ সাল এবং মার্ক্সবাদের উত্থানের আগে 'সমাজতন্ত্র' ইউরোপের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার কাছে কোন ভয়ের এবং আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। তখন সমাজের সুবিধাভোগী রক্ষণশীলেরা আতঙ্কিত হত 'গণতন্ত্র' শব্দটির দ্বারা। অনেকদিন ধরেই সমাজতন্ত্র কতগুলি পর্যায় পেরিয়ে বিকশিত হচ্ছিল। এগুলি ছিল সমাজতন্ত্রের প্রারম্ভিক, কল্পান্ত অভিসারী, স্থূল অর্থে মানবিক পর্যায়। অসংখ্য ধর্মীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায় তখন ছিল যারা একদিকে শিল্পায়নের যন্ত্রণা ও জাতীয় যুদ্ধের আলোড়নের বাইরে আমেরিকায় গিয়ে সরল যূথবদ্ধ সমাজজীবন উপভোগ করতে চাইত। তাদের কাছে সনাতন জীবনের জটিলতা ও আড়ষ্টতার বাইরে সমাজতন্ত্র একটি সরল জীবনবোধকে বোঝাত [David Thompson, Europe since Napoleon, Ch. 7]। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমাজতন্ত্র (Socialism) এবং কমিউনিজম (Communism) এই দুইয়ের মধ্যে রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে কোন পার্থক্য করা হত না। তখন সমাজতন্ত্র যতখানি তার প্রাকৃতিক আশ্রয় পেয়েছিল ইউরোপে তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছিল আমেরিকায় যেখানে অফুরন্ত জমি ও স্বাধীন প্রবেশাধিকার ইউরোপের জীর্ণ রাজতন্ত্রগুলি থেকে মুক্তিকামী মানুষকে হাতছানি দিত ["until after 1850 or so, socialism and communism (at first hardly distinguishable as political ideas) found that natural home not in Europe but in the United States, where abundance of land and free

immigration offered a new mode of life to all who wanted to escape from the restored monarches of Europe"]। **রবার্ট ওয়েন** (Robert Owen) তাঁর **নয়া সাম্যের** (New Harmony) যে পরীক্ষা ইন্ডিয়ানাতে করেছিলেন বা এটিয়েঁ ক্যাবে (Etienne Cabet) ইলিনয়েসে (Illinois) যে **আইকেরিয়ান কমিউনিটির** (Icarian community) পরিকল্পনা করেছিলেন তা সবই ছিল প্রারম্ভিক সমাজতন্ত্রের কল্পিত স্বপ্ন ভুবন। মানবিক সাম্য (human equality) এবং স্ব-শাসন (self-government) এই দুইয়ের সম্মিলনে গড়ে ওঠা এক মার্জিত জীবন ছিল এই স্বপ্ন-ভুবনের বিষয় যা মার্ক্স-পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্র নির্মাণ করতে চেয়েছিল। এই নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নালু সমাজতন্ত্রের দান। এই সমাজতন্ত্র অসার্থক নয় কারণ নয়া দুনিয়ার (New World)—আমেরিকার অপরিমিত সম্পদ ও অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে সাম্যবাদী সংগঠনের যে স্বপ্ন তারা দেখেছিল যে রক্ষণশীল ইউরোপের পুরানো দুনিয়ায় কোন সাম্যের ভুবন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নয়া দুনিয়ায়—অর্থাৎ আমেরিকায়—বিপুল মানুষের অভিবাসন রক্ষণশীল ইউরোপের পুরানো দুনিয়ার প্রতি হতাশাকে ভিত্তি করেই প্রারম্ভিক সমাজতন্ত্রের স্বপ্নালু আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল [David Thompson-এর গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]।

২.৩ ফরাসী দর্শন ও সমাজতন্ত্র

আদিপর্বের সমাজতন্ত্রের ধারণা অনেকটাই জন্ম নিয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের দর্শন থেকে। রুশো (Rousseau), **এবে ম্যাব্লি** (Abbé Mably), **এলভেসিয়াস** (Helvetius) প্রমুখ দার্শনিকদের লেখা থেকে প্রথম পর্বের সমাজতন্ত্রের অস্পষ্টবোধ আত্মপ্রকাশ করেছিল। রুশো লিখেছিলেন যে মানুষ জন্মে স্বাধীন, সমাজ তাকে শৃঙ্খলিত করে—"Man is born free and everywhere he is in chains" (Contrat Social, I, i)। ম্যাব্লি রুশোর সাথে সহমত হয়ে বলেছিলেন যে সম্পত্তি ও অধিকারের বৈষম্য থেকে জন্ম নেয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অমঙ্গল। তিনি স্পষ্ট করে লিখেছিলেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে (Private property) মেনে নিয়ে এবং তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে মানুষ সভ্যতার সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এলভেসিয়াস লিখেছিলেন যে মানুষ শক্তি ও ক্ষমতায় জন্মগতভাবে সমান। সমাজ ও সরকারের অব্যবস্থা এই ক্ষমতার বৈষম্য আনে। অতএব তিনি দাবি করেছিলেন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার। আরেকজন ফরাসী দার্শনিক এই সময় প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনি হলেন **ব্যারণ ডি হলব্যাক**

প্রান্তলিপি

"রুশোর সামাজিক চুক্তি হবসের সামাজিক চুক্তির ঠিক বিপরীত। হবস বলেন যে প্রাক্ সামাজিক জীবনে মানুষ ছিল নিঃসঙ্গ, হিংস্র, হীন এবং জঘন্য। তারা শুধু আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য লড়াই করত। এই হিংস্র জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে একটি তৃতীয় শক্তির কাছে তাদের সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার সমর্পণ করল। এই তৃতীয় শক্তি হল রাষ্ট্র। সকলের আত্মসমর্পণকে আত্মসাৎ করে এক দুর্ধর্ষ, অপ্রতিরোধ, বেপরোয়া সংগঠন। আর সমস্ত মানুষ হয়ে রইল ক্ষমতাহীন প্রজা, রাষ্ট্রের কাজে বলিপ্রদত্ত। রুশো বললেন যে এক সামাজিক পরিবেশে মানুষ ছিল স্বাধীন, বর্বর হলেও মহান (Noble Savage)। নিজের এই প্রকৃত স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করার জন্য মানুষ সমাজ গঠন করল। তারা চুক্তি করল নিজেদের মধ্যে— একের সাথে অন্যের, সকলের সাথে সকলের চুক্তি। এই চুক্তির দ্বারা নিজেদের সম্মিলিত অস্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করল, কোন তৃতীয় পক্ষ বহিঃশক্তির কাছে নয়। এর ফলে যে রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হল প্রত্যেক মানুষ হয়ে রইল সেই রাষ্ট্রশক্তির অংশ, তার অবিভাজ্য উপাদান। এইভাবে হবসের লেখা থেকে জন্ম নিল দায়িত্বহীন (irresponsible) স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, আর রুশোর লেখা থেকে জন্ম নিল প্রজাতন্ত্র যা শাসিত হত সকলের সাধারণ ইচ্ছা বা General will-এর দ্বারা।

(Baron d' Holbach)। তিনি রুশোর সামাজিক চুক্তি অনুসরণ করে বললেন যে সমাজজীবনে সরকার ও জনগণের মধ্যে এক অলিখিত চুক্তি আছে। সরকারের কাজ হল মানুষের কল্যাণ করা, সাম্যের ভিত্তিতে তার মঙ্গলসাধন করা, জনগণকে স্বাধীনতা দেওয়া। এ কাজ থেকে বিরত হলে সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই।*

এইভাবে ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক কালে ফ্রান্সে সমাজ কল্যাণের লক্ষ্যে সমাজ পরিবর্তনের দর্শন আত্মপ্রকাশ করছিল। মনে রাখতে হবে যে ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে প্রায় একশত বছর ধরে ইউরোপে যে অর্থনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তার থেকেই সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়। চার্চ ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের (Church and Nobility) জমি রাষ্ট্র কেড়ে নিয়েছিল। তখন থেকে আলোচনা শুরু হয়েছিল সম্পত্তি ও তার অধিকার নিয়ে, প্রশ্ন উঠেছিল ব্যক্তি সম্পত্তি মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক কিনা এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছিল গরীব মানুষের সম্পত্তিহীনতা যা তার দারিদ্রের সূচক তা সম্পত্তিবানদের ষড়যন্ত্র প্রসূত এক বিরাট সামাজিক অপকর্ম ছাড়া আর কিছুই নয় [দ্রষ্টব্য William Archibald Dunning, A HISTORY OF POLITICAL THEORIES : FROM ROUSSEAU TO SPENCER. Ch. IX]। এতৎসত্ত্বেও কার্ল মার্ক্সের আবির্ভাবের আগে সমাজতন্ত্র যে একটি মহান দর্শনে পরিণত হয়নি তার কারণ সে সময়ে বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা ভিন্ন বিষয় নিয়ে মগ্ন ছিলেন। উদারনীতিকরা (Liberals) ভাবতেন স্বাধীনতার আদর্শ (ideal of liberty) নিয়ে। গণতান্ত্রিকরা (Democrats) ভাবতেন সাম্যের আদর্শ (ideal of equality) নিয়ে। গণতান্ত্রিকরা (Democrats) ভাবতেন সাম্যের আদর্শ (ideal of equality) নিয়ে। ফলে সমাজতন্ত্রীরা সাম্যকে একান্তভাবে নিজেদের বিষয় বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। প্রারম্ভিক পর্যায়ে সমাজতন্ত্রীরা সৌভ্রাত্রের আদর্শ (ideal of fraternity) নিয়ে বেশি ভাবিত ছিল ["Just as liberals placed greatest emphasis on the ideal of liberty, and democrats on the ideal of equality, so socialists cherished particularly the ideal of fraternity"-David Thompson]। তাদের ধারণা ছিল এই যে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ভাল এবং সুন্দর। সামাজিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য নামক কৃত্রিম বিকৃতি না থাকলে প্রত্যেক মানুষ অন্য মানুষের সাথে ভ্রাতৃভাবে বিরাজ করত। প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতাই মানুষের প্রবৃত্তি-সঞ্জাত বাসনা (instinctive desire)। অতএব স্বাধীনতা (liberty) এবং সাম্য বা সমানাধিকারের (equity) আদর্শকে যদি প্রয়োগযোগ্য বিষয় হিসাবে একটি যৌক্তিক বিন্দু (logical point) পর্যন্ত প্রসারিত করা যায় তবে আসবে আত্মপ্রকাশের জন্য পূর্ণ মুক্তি (Complete equality of opportunity and of wealth)। ঠিক তখনই শুরু হবে সৌভ্রাত্রের রাজত্ব। ঐতিহাসিকের ভাষায় "...and the reign of fraternity would begin"।

স্পষ্টতই এই ধারণার মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের (liberty, equality and fraternity) বাণী দীপ্যমান। মনে রাখতে হবে প্রথম পর্বের সমাজতান্ত্রিক দার্শনিকেরা যারা ফরাসীদের বিপ্লব আদর্শ থেকে বাণী গ্রহণ করেছিল তারা শিল্পবিপ্লবের প্রবহমান ধারাকে ততটা সম্যকভাবে বুঝতে পারেননি যতটা বুঝতে পেরেছিলেন পরবর্তীকালে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কার্ল মার্ক্স এবং এঙ্গেলস্-এর মতো দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদরা শিল্প-বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে স্পষ্টভাবে বুঝতে না পারলেও তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ইউরোপ অর্থাৎ পুরানো দুনিয়ায় এক শিল্প-মনস্কতা বা **শিল্পবাদ** (industrialism) আত্মপ্রকাশ করছে যার

ভেতরে আছে নিঃসীম শোষণের একটা ছবি। এই শিল্পবাদ দরিদ্র ও বৈষম্যের কারণ একথা ভেবে তারা চেষ্টা করতেন এই শিল্পবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। প্রতিবাদ আন্দোলন সবল না হলে তার মর্যাদা থাকে না। ফলে প্রথম পর্বের সমাজতন্ত্রী আন্দোলন ইউরোপে শিকড় গাঁথতে পারেনি ["often protesting against industrialism as a new cause of property and inequality, early socialist movements could never find roots or room in Europe"—David Thompson] আরও পরে যখন সমাজতন্ত্রের তত্ত্বগুলি **লুই ব্লাঁ**-র (Louis Blanc) মতো রাষ্ট্রবাদী সমাজতন্ত্রী (State socialists) বা কার্ল মার্ক্স (Karl Marx)-এর মতন বিজ্ঞানমনস্ক অর্থনীতিবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হল তখন সমাজতন্ত্রের দর্শন পূর্ণতালাভ করে ইউরোপের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়িত দেশগুলির দৈনন্দিন চাহিদা ও প্রযোজনীয়তাকে নিজের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হল। তারপর থেকে সমাজতন্ত্র ইউরোপের পূর্ণাঙ্গ মহাদেশীয় দর্শনের রূপ লাভ করল।

২.৪ প্রথম পর্বের কল্পান্তিক সমাজতন্ত্র

প্রথম পর্বের সমাজতন্ত্রীদের বলা হত **কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রী** (Utopian Socialists)। কল্পান্তিক শব্দটি এসেছে স্যার টমাস মোর-এর (Sir Thomas More) utopia বা **কল্পলোক** নামক গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থটিতে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের (Ideal State) বর্ণনা রয়েছে। কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রীদের পরিকল্পনা ছিল সমাজকে নতুন করে সংগঠিত করা এবং এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার আয়োজন করা যেখানে শ্রমের মুনাফা সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হবে। কল্পান্তিক সমাজতন্ত্র প্রারম্ভিক সমাজতন্ত্র যেখানে সমাজ পরিবর্তনের দর্শন ছিল প্রগাঢ়ভাবে স্বপ্নাবিষ্ট ও আচ্ছন্ন। সেখান থেকে যাত্রা করে সমাজতন্ত্র উনিশ শতকের শেষে এক বিজ্ঞান ভিত্তিক অর্থনৈতিক সূত্রের (Scientific economic formula) মধ্যে পরিণতি লাভ করেছিল। কল্পান্তিকতা (Utopianism) এবং বিজ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিকতা এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝে আছে নানা ধরনের সমাজতন্ত্র —রাষ্ট্রবাদী সমাজতন্ত্র (State Socialism), সিন্ডিক্যালিজম্ নৈরাজ্যবাদ (anarchism) আরও নানা সূক্ষ্ম ভেদাভেদ। আদ্যিকালের এক ঐতিহাসিক কেটেলবি (D. M. Ketelbey-A History of modern times from 1789 to the Present Day (p. 337) লিখেছেন যে সমাজতন্ত্রের দর্শনের মধ্যে ২৬০ রকমের সমসাময়িক সংজ্ঞা লুকিয়ে আছে। এজন্য কথায় বলা হত যতজন সমাজতন্ত্রী আছে ঠিক ততরকম সমাজতন্ত্রের ভেদ রয়েছে—"There are as many varieties of socialism as there are socialists."

কল্পান্তিক পর্বের প্রথম প্রবক্তা হলেন রবার্ট ওয়েন (Robert Owen)। তাঁর সময়কাল ১৭৭১ থেকে ১৮৫৮। তিনি ছিলেন একজন ধনী শিল্প-নির্মাতা। **স্কটল্যান্ডে নিউল্যানার্ক** (New Lanark) নামক স্থানে তিনি একটি কারখানা শহর (factory town) তৈরি করেছিলেন। একে সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিকেরা প্রথম পর্বের একটি আদর্শ সমাজ (model society) বলে উল্লেখ করেছেন। ওয়েন বিশ্বাস করতেন যে সারা পৃথিবীতে এরকম ছোট ছোট আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে। এই রকম এক একটি সমাজে ১২০০ করে মানুষ থাকবে। তারা সবাই একটি মস্ত বড় বাড়িতে থাকবে এবং ক্ষেত খামার, কারখানা যেখানেই তারা কাজ করুক তাদের শ্রমের থেকে

উদ্ভূত লাভের অংশীদার হিসাবেই সেখানে তারা বিরাজ করবে। ওয়েনের আদর্শকে সম্বল করে নিউ ল্যানাকের ছায়ায় কিছু সমাজ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারা কেউই স্থায়ী হতে পারেনি। ওয়েনের প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। তাঁর প্রেরণা থেকে জন্ম নিয়েছিল এক নতুন ধরনের সমবায় আন্দোলন। শ্রমজীবী মানুষ জমিতে বা কারখানায় যেখানেই তার শ্রমদান করুক না কেন শ্রম থেকে সৃষ্ট মুনাফার অংশ তারা পাবে এই ভাবনাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল রবার্ট ওয়েনের আন্দোলনের ফলেই। মনে রাখতে হবে যে ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে ওয়েনের নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের মুক্তি।

কল্পান্তিক দার্শনিকদের মধ্যে আরেকজন প্রধান দার্শনিক ছিলেন কোঁৎ দ্য সেঁ সিমঁ (Comte De St Simon)। তিনি একজন ফরাসী অভিজাত। তিনি ফরাসী বিপ্লব ও চলমান শিল্প-বিপ্লব থেকে তথ্য ও সচেতনতা গ্রহণ করে এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং রাজনৈতিক বিপ্লব প্রসূত প্রগতি যে বিপুল সামাজিক শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেছে তাকে সাধারণের স্বার্থে ব্যবহার করা উচিত। বলা হয়ে থাকে যে সমাজের সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর স্বার্থে সমাজ সংগঠনের জন্য তিনিই সর্বপ্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার উদ্ভাবন করেছিলেন ["Saint Simon was the first to announce a socialistic scheme for the reorganization of society in the interest of the most numerous class"—Charles Downer Hazen, Modern Europe upto 1945, ch. xv)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমস্ত উৎপাদনের হাতিয়ার (means of production) রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রেরই কর্তব্য হল শিল্পকে সংগঠিত করা। শিল্প সংগঠনের নীতি হবে একটাই, তাঁর ভাষায়—'Labour according to capacity, reward according to services"—ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রমদান, সেবার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুরস্কার। এ কথার অর্থই হল যে কর্মের গুণগত প্রভেদ অনুযায়ী পুরস্কারের পার্থক্য তিনি মেনে নিয়ে ছিলেন। সমাজের বনিয়াদ অর্থনীতির মধ্যে প্রোথিত একথা জেনেই তিনি তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন—এক, পরজীবী অনুৎপাদকদের হাত থেকে উৎপাদন প্রসূত সম্পদকে মৌল উৎপাদক শ্রেণীর (primary produces) নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছিলেন, দুই, কর্মসংস্থানে রাষ্টের ভূমিকাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, তিন, উৎপাদনে সামাজিক মালিকানা বহাল রেখে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িক জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের দ্বারা তার প্রশাসন চালু করতে চেয়েছিলেন।

সেঁ-সিমঁর (Sanit Simon) সমসাময়িক ছিলেন **শার্ল ফুরিয়ের** (Charles Fourier)। তিনি ছিলেন **ফালাঁস্তার**-এর (Phalanstere) প্রবক্তা। ফালাঁস্তার হল একটি সহযোগিতামূলক উপনিবেশ। ফুরিয়ের মনে করতেন যে এই উপনিবেশ হল এক একটি সামাজিক একক। এরকম অনেক ফালাঁস্তার নিয়ে একটি করে সমাজ গঠিত হবে। প্রত্যেক ফালাঁস্তারে থাকবে ১৫০০ বা ১৬০০ মানুষ। তারা বাস করবে যৌথভাবে এক একটি অট্টালিকায় এবং তারা কাজও করবে একসাথে। এইভাবে যৌথ শ্রমদান ব্যবস্থার মধ্য থেকে যে আয় হবে তার শ্রমের সাথে সমানুপাতিক ভাগ সবাই পাবে। মানুষের আয় ও মর্যাদা যে সমান হবে না তা তিনি যেমন মেনে নিয়েছিলেন তেমন মেনে নিয়েছিলেন সম্পত্তির অধিকার। ফুরিয়ের মত অনেকটা ওয়েনের মতের কাছাকাছি ছিল। দুজনকেই উৎপাদকদের সমবায়ের প্রবক্তা বলে উল্লেখ করা হয়। সেঁ-সিমঁ এবং শার্ল ফুরিয়ের দুজনেই ছিলেন 'দূরকল্পী চিন্তাবিদ' (Speculative thinkers)। তাঁরা বাস্তব কর্মকুশল মানুষ ছিলেন না। কিন্তু তারা সমাজ

পরিবর্তনের বোধকে জাগিয়ে ছিলেন, আর তুলে ধরেছিলেন একটি দর্শন যার ভিত্তিতে বৃহত্তর জনস্বার্থের কর্মসূচিকে কোন রাষ্ট্রিক প্রকল্পের মধ্যে আনা যেত। একজন দক্ষ মানুষ—রাজনীতিবিদ, দলের নেতা, জনগণের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার মত সক্ষম এমন যে ব্যক্তি তিনিই এই প্রারম্ভিক সমাজতন্ত্রের কল্পান্তিক স্বপ্নকে সার্থক করতে পারতেন। এরকম একজন মানুষ ছিলেন **লুই ব্লাঁ** (Louis Blanc) যিনি জুলাই রাজতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র আসার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। তাঁর লেখায় তিনি ফ্রান্সের শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, বোঝাতে চেয়েছিলেন যে চলমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আড়াল করা আছে নিপীড়নের কী মহাশক্তি। তিনি সামাজিক অমঙ্গলকে উচ্ছেদ করে ন্যায় ও সাম্যের রূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। বুর্জোয়াজির (Bourgeoisic) দ্বারা পরিচালিত সরকারকে তিনি ধনীদের, ধনীদের দ্বারা গঠিত ও ধনীদের স্বার্থে পরিচালিত সরকার বলেছেন, "a government of the rich, by the rich, and for the rich"। তিনি চাইতেন যে এধরনের রাষ্ট্র মুছে যাক। তার স্থানে আসুক গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সরকার। লুই ব্লাঁ ঘোষণা করেছিলেন যে মানুষের জন্য কর্মসংস্থান রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং কর্মলাভ করাটা প্রত্যেক মানুষের একটি অচ্ছেদ্য অধিকার। মানুষকে তার অধিকারে আশ্বস্ত করতে হলে সরকারকে শিল্প-সংগঠন করতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র তার মৌলিক কর্তব্য থেকে চ্যুত হবে। লুই ব্লাঁ বলেছিলেন যে রাষ্ট্রকে তাঁর নিজস্ব পুঁজি দিয়ে জাতীয় কর্মশালা (national workshop) প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই কর্মশালার তদারকি ও পরিচালনা করবে শ্রমিকরা যাতে শেষ পর্যন্ত তাদের শ্রমের ফসল তারা লাভ করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা মালিক শ্রেণী (employers) উঠে যাবে এবং শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃত্বে আসীন হবে। লুই ব্লাঁর এই মত ছিল সরল ও স্বচ্ছ এবং শ্রমিক কর্মসূচিতে তা গৃহীত হয়েছিল। এইভাবে একটি সমাজতন্ত্রী দলের জন্ম হয়। এই দল প্রজাতন্ত্রে (Republic) বিশ্বাস করত। প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী আরও দুএকটি দল ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে এই দলের পার্থক্য হল এই যে তারা শুধু সরকারের পরিবর্তন চাইত। এই দল চাইত সমাজ পরিবর্তন, সরকার পরিবর্তন এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় মাত্র।

২.০ সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ের বৌদ্ধিক রচনা

সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ের দার্শনিকেরা নানাবিধ গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বোধের উন্মেষ ঘটিয়ে ছিলেন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে প্রায় সমার্থক করে দিয়ে সমাজতন্ত্রকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন পি. লেরুক্স্ (P. Leroux) এবং জে. রেনো (J. Renaud) তাঁদের লেখা অ্যাঁসিক্লোপোদি নূতেল ও অন্যান্য নানা রচনায়। ১৮২৮ সালে ফিলিপ মিশেল বুওনারত্তি 'সমানদের ষড়যন্ত্র' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বাবউফের ধারণাকে সারা ইউরোপীয় মহাদেশে প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন বড় লেখক হলেন সেঁ-সিমঁ। তিনি সংহতিবাদী ছিলেন এবং মনে করতেন যে মানুষের সমাজ একটি বিশ্বব্যাপী সংহতির দিকে এগুচ্ছে। এই সংহতিতে খ্রিস্টধর্ম, বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক চার্চের একটি ভূমিকা রয়েছে। তাই তিনি একটি বই লেখেন, তার নাম নুভো ক্রিস্তিয়ানিজম (Nouveau Christianisme) বা নতুন খ্রিস্টধর্ম। এই গ্রন্থে তিনি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বসমাজের জন্য নতুন ধর্মের প্রস্তাব করেন। ১৮০৮ সালে শার্ল ফুরিয়ের (Charles Fourier) তাঁর মতামত প্রকাশের জন্য রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **তেওরি দে কাতর মুভমঁ**

(Theories des quatre movements) এছাড়াও ফুরিয়ের আরও গ্রন্থ লিখেছিলেন। ইংল্যান্ডে সমাজতান্ত্রিক গ্রন্থ রচনার ধারা তৈরি করেছিলেন রবার্ট ওয়েন। তিনি মনে করতেন যে মানুষের সামাজিক সংস্কারের কথা সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে। তবেই মানুষের নৈতিক সংস্কার আনা সম্ভব হবে নচেৎ নয়। তাছাড়া মানুষের যৌথ অস্তিত্ব ও সমবায়িত জীবনের আদর্শকে তিনি তুলে ধরেন। তাঁর এই মতবাদ প্রকাশের জন্য তিনি লিখেছিলেন **নিউ ভিউ অফ্ সোসাইটি** (New View of Society) এবং **রিপোর্ট টু দ্য কাউন্টি অফ্ ল্যানার্ক** (Report to the Country of Lanark)। তাঁর আদর্শকে সার্থক করার জন্য তিনি সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, ফুরিয়ের মতো তিনি রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থাপনাকে নিষ্প্রয়োজন ভেবে নিজেকে সরিয়ে রাখেননি। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পর (Napoleonic Wars) তিনি সরকারের কাছে দুটি আবেদন রেখেছিলেন—এক, কারখানা সংক্রান্ত আইনের দ্বারা শ্রমিকদের রক্ষা করা হোক এবং দুই, গ্রামের সমবায় প্রতিষ্ঠা করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জনকল্যাণের ব্যবস্থা করা হোক। এব্যাপারে সরকারের অনাগ্রহ দেখে তিনি আবেদন করেছিলেন মানবদরদী জনসমাজের কাছে। সেখানেও যথেষ্ট সাড়া না পেয়ে তিনি সরাসরি শ্রমিক শ্রেণীর কাছে যান।

প্রান্তলিপি

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে ফ্রাঁসোয়া নোয়েল বাবউফ (Francois Noel Babeuf) ছিলেন সমাজতন্ত্রের 'প্রারম্ভিক বিন্দু'। তিনি ছিলেন সমানদের সমিতির (Societe des Egaux) নেতা। ১৭৯৬ সালে ফ্রান্সে ডিরেক্টরির বিরুদ্ধে একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান হয়েছিল। তিনিই ছিলেন তার নায়ক। কার্যকর সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি প্রণয়নে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। কারও কারও মতে সমানদের ইশতাহারই (Manifeste des Egaux) হচ্ছে প্রথম সমাজতান্ত্রিক ধারণার দলিল। বাবউফ ও তাঁর অনুগামী ও সমর্থকরা মনে করতেন যে ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব একটি যুগপরিবর্তনকারী ঘটনা। তাকে পরিণতির দিকে নিতে হলে ভূমি ও শিল্পের সামাজিকীকরণ দরকার। স্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে তাঁরা মানুষকে জানিয়ে ছিলেন যে প্রকৃতির সম্পদকে ভোগ করার পূর্ণ অধিকার মানুষের আছে। তা তাদের স্বাভাবিক অধিকার। এই অধিকার মানুষকে ভোগ করতে হবে। তার দারিদ্রের অবসান ঘটাতে হবে। তাকে সমস্ত মানবিক সুখ উপভোগ করতে দেওয়ার অধিকার দিয়ে তার সামাজিক অবস্থানকে নিশ্চিত করতে হবে।

২.৬ পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র : কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেলস

আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথম থেকে ইউরোপে সমাজ চেতনার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল এবং তার সঙ্গে বদলাচ্ছিল সমাজতন্ত্রের দর্শন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে সমাজতন্ত্রের দর্শন ও কর্মসূচি ইউরোপের রাজনীতি ও সমাজাদর্শে স্থায়ী আসন লাভ করতে থাকে। ১৮২০-র দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত 'সমাজতন্ত্রী' (Socialist) ও 'সমাজতন্ত্র' (Socialism) শব্দ দুটি তাদের আচ্ছন্নতা কাটাতে পারেনি। ১৮৪১ সালে ওয়েন-পন্থীরা সরকারিভাবে এই শব্দ দুটিকে গ্রহণ করে। এ সময় থেকে এ ধারণা জমে উঠেছিল যে মোটামুটিভাবে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর তার রূপান্তর ঘটাতে হবে। সমাজসত্তার অর্থনৈতিক রূপান্তরের কথা নতুন নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে **জন লিলবার্ণ**-এর (John Lilburne) নেতৃত্বে লেভেলাররাও (Levellers) সম্পত্তির বৈষম্য, একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা জনিত ধন ও প্রতিপত্তির তারতম্যকে ভেঙে ফেলে সমাজে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদকে সমান (Level) করে দিতে

চেয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে আবেগ ছিল বেশি, বোধ ছিল আচ্ছন্ন। ফলে বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ শৃঙ্খলার ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে সমস্যা সমাধানের অর্থনৈতিক সূচিগুলিকে তারা বুঝতে পারেননি। তারা সামাজিক সমস্যার উৎসকে খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু সেই সমস্যার অন্তর্পটে সভ্যতার উত্থান-পতনের মৌল নিয়মগুলিকে তারা আবিষ্কার করতে পারেনি। কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রীরা যখন এলেন তখন সমস্যা শিল্প-বিপ্লবের অভিঘাতে আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। নতুন যুগে সমাজবিবর্তনের বিজ্ঞানকে যারা বুঝতে চেয়েছিল সেই কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রীরা অন্তত এটুকু বুঝেছিল যে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে তার অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর। অতএব জীবন ও কর্মের সংগঠনের জন্য মানুষকে ব্যক্তিগত শক্তির পরিবর্তে সামাজিক শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে, ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণকে উচ্ছেদ করে সেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে হবে। তাহলেই সমাজের রূপান্তর ঘটবে, না হলে নয়। এই ভাবে সমাজে ব্যক্তি শক্তির বদলে যূথশক্তির অনিবার্যতার ধারণা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, আর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই বোধ যে যাকে আমরা সমাজ বলি তা আসলে একটি বাহ্যিক সত্তা। যার নিগূঢ় অন্তর্পটের অদৃশ্য, পরিচালিকা শক্তি হল অর্থনীতি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এবার এই বোধ পাকাপাকি হতে লাগল যে অর্থনীতিই যেখানে প্রধান সেখানে বস্তুর ভূমিকাই প্রধান—বিমূর্ত মন ও অপার্থিব চৈতন্য সেখানে অপ্রধান। এইভাবে সমাজতন্ত্রের দর্শনে সমাজ শৃঙ্খলাকে কোন অনির্ণীত অলৌকিকের অভিপ্রায় সঞ্জাত না ভেবে বস্তুঘন পৃথিবীর বস্তুকেন্দ্রিক মানবিক সম্পর্কের উপস্থাপনা ভিত্তিক ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত হতে লাগল।

কাল মার্ক্স ও ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেলস :

ইউরোপে সমাজতন্ত্রের দর্শন ও কর্মসূচি পরিণতি লাভ করেছিল **কাল মার্ক্স** (Karl Marx) ও **ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেলস**-এর (Friedrich Engels) হাতে। তাঁরা ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদকে উপস্থাপিত করেছিলেন। সমাজ পরিবর্তনের অর্থনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছিলেন, শ্রেণী সংঘাতকে ইতিহাসের চালিকা শক্তি বলে প্রমাণ করেছিলেন এবং দ্বান্দ্বিকতার তিনটি অমোঘ সূত্রকে ইতিহাস ও দর্শনকে বোঝার প্রামাণ্য হাতিয়ার—দর্শনের ভাষায় 'লজিক'—রূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মার্ক্স ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ **ডেভিড রিকার্ডো** (David Ricardo) ও অন্যান্য ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের থেকে **মূল্যের শ্রমতত্ত্বটি** (Labour Theory of Value) গ্রহণ করেছিলেন। এই তত্ত্বের মূলকথা হল এই যে কোন দ্রব্যের 'অর্থনৈতিক মূল্য' (economic value) লুকিয়ে আছে 'ঘনীভূত মানবশ্রমের মধ্যে' (in

প্রান্তলিপি

হাইনরিক কার্ল মার্ক্স (Heinrich Karl Marx) [1818–1883] জন্মেছিলেন এশিয়ার রাইন অঞ্চলে ট্রিয়ার (Trier) নামক স্থানে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ইহুদী আইনজীবী। তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাশিয়ার একজন রাজকর্মচারী। ঢিলেঢালা জীবনে অভ্যস্ত তাঁর সংসারে একটা শিক্ষার বিভাস সদা-সর্বদা বিরাজ করত। সংসারের সহজভাব ও আলোকপ্রাপ্ত মন এই নিয়ে মার্ক্স বড় হয়েছিলেন। বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাস ও দর্শন নিয়ে পড়াশুনা করেন। অর্থনীতি তিনি পাঠ করেছিলেন পরে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করার সময়ে। তিনি দার্শনিক হেগেলের শিষ্য ছিলেন কিন্তু চিন্তায় ছিলেন তাঁর বিপরীত। হেগেল বিশ্বাস করতেন মন আগে, বস্তু পরে। মার্ক্স ঠিক এর বিপরীতটিতেই বিশ্বাস করতেন। ১৮৪৩ সালে মার্ক্স বিপ্লবীদের মিলনকেন্দ্র প্যারিসে চলে যান এবং সেখানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয় ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেলস-এর (১৮২০-১৮৯৫) সঙ্গে যিনি এর পর থেকে সারাজীবন তাঁর বন্ধু ছিলেন। এঙ্গেলস একজন বিত্তশালী জার্মান সূতা ব্যবসায়ীর সন্তান ছিলেন এবং কিছুদিন ম্যাঞ্চেস্টারে বসবাস করে ইংল্যান্ডে শিল্পায়িত নগর সভ্যতার সংকট নিজের চোখে দেখে এসেছিলেন। তিনি মার্ক্সকে অনেক সাহায্য দিয়েছেন। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর মার্ক্স পাকাপাকিভাবে ইংল্যান্ডে বসবাস করেন। সারা জীবন তিনি অসহনীয় দারিদ্র্যকে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু বিপ্লবের পথ থেকে সরেননি। হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে (Highgate) তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়।

'human labour crystallized')। এই 'ঘনীভূত মানবশ্রম' হল আসলে সেই বস্তুর নির্মাণে শ্রমিক মানব যে শ্রম দিয়েছেন সেই শ্রম। এই তত্ত্বটিকে মার্ক্সের আগে রিকার্ডো এইভাবে বলেছিলেন— কোন দ্রব্যের মূল্য তার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আপেক্ষিক শ্রমের উপর নির্ভর করে ('the value of a commodity' depended 'on the relative quantity of labour necessary to its production')। এর থেকে আরও এক পা এগিয়ে রিকার্ডো ও অন্যান্য অর্থনীতিবিদরা বললেন যে শ্রমের নিজস্বমূল্য অর্থাৎ মজুরির হার—সেই বস্তুর উৎপাদক শ্রমিকের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খরচের সমানুপাতিক ("...the value of labour itself, or the rate of wages, similarly depended upon the cost of the labourer's subsistance"—R. N. carew Hunt, The Theory and Practice of Communism, p.81) কার্ল মার্ক্স এই মূল্যের শ্রমতত্ত্বকে (Labour Theory of Value) সমাজতন্ত্রের অপরিহার্য একটি সূত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে জার্মানির সমাজতান্ত্রিক নেতা **ফার্ডিনান্ড লাসাল** ও (Ferdinand Lassalle) এই তত্ত্বকে 'মজুরির লৌহ নিয়ম' (Iron Law of Wages) বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। মার্ক্স আরও অগ্রসর হয়ে দাবি করলেন যে বস্তুর মূল্য যদি প্রদত্ত শ্রমের উপর নির্ভর করে তবে বস্তুর মূল্য বা মূল্য সঞ্জাত মুনাফা কেন সেই শ্রমিককে দেওয়া হবে না যে শ্রমিক সেই বস্তুর উৎপাদনে নিজের শ্রমদান করেছে? [পঠিতব্য গ্রন্থ Bertrand Russell, Freedom and Organization, p.129]। মার্ক্স লিখলেন যে প্রত্যেক শ্রমিকের বেঁচে থাকার জন্য, অর্থাৎ বেঁচে থাকার উপকরণ উপার্জনের জন্য যেটুকু শ্রম প্রদান তাকে করতে হয় পুঁজিপতি মালিকরা তার অনেক বেশি শ্রম শ্রমিকদের কাছ থেকে আদায় করে নেয় অথচ এইভাবে আত্মসাৎ করা শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য যা শ্রমিকের পাওয়া উচিত তা তাকে দেওয়া হয় না। এইভাবে শ্রমিকরা তাদের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম উপকরণ যা না হলে তারা বাঁচবে না, শ্রমের উৎস শ্রমিকের প্রজনন বন্ধ হয়ে যাবে, সেই টুকু পাওয়ার জন্য যে শ্রম, যাকে প্রয়োজনীয় শ্রম (Necessary Labour) বলা হয়, তার মূল্যটুকু সম্বল করে তাদের জীবন ধারণ করতে হয়। শ্রমিকের সমস্ত উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য পুঁজিপতি মালিকরা আত্মসাৎ করে নেয়। এইভাবে পুঁজিবাদে পুঁজিপতিরা ক্রমশ স্ফীত হয়, শ্রমিকরা ক্রমশ নিঃস্ব হয় (The rich becomes riches, the poor becomes poorer)। এইভাবে তৈরি হয় দুটি শ্রেণী—মালিক ও শ্রমিক, শোষক ও শোষিত, উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি নিয়ন্ত্রণ করা পুঁজিপতি ও সর্বহারার দল যাদের শৃঙ্খল ছাড়া আর হারানোর কিছুই থাকে না। এই উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্যকে আত্মসাৎ করে নিয়ে পুঁজিপতির স্ফীত হওয়ার ঘটনাকে নিয়ে যে তত্ত্ব মার্ক্স লিখেছিলেন তাকে **উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব** (Theory of Surplus value) বলা হয়। তাঁর **ডাস ক্যাপিটাল** (Das Capital) নামক গ্রন্থে তিনি এই তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেন।

আজকের দিনে মার্ক্সবাদ বলতে আমরা যে রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক দর্শনকে বুঝে থাকি তা তিনটি আকর বিষয়কে নিয়ে গঠিত হয়েছে—(এক) হেগেলের* কাছ থেকে পাওয়া এক দ্বান্দ্বিকতার দর্শন যাকে মার্ক্স তার ভাববাদের খোলস থেকে বার করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের রূপ দিয়েছিলেন যার থেকে পরে নিসৃত হয়েছিল তাঁর দ্বান্দ্বিক ইতিহাসের বস্তুতত্ত্ব, (দুই) এক রাজনৈতিক অর্থনীতি (political economy) যার দুটি প্রধান বিষয় হল মূল্যের শ্রমতত্ত্ব ও উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Labour Theory of Value and Theory of Surplus value) এবং এই দুটি থেকে নিঃসৃত অন্যান্য সূত্র [এই সূত্রগুলি উপরে আলোচিত হয়েছে], এবং (তিন) রাষ্ট্র ও বিপ্লব তত্ত্ব (A Theory of State and Revolution)। মার্ক্স তাঁর অর্থনীতির তত্ত্ব পেয়েছিলেন

ইংল্যান্ডের ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে, তাঁর দ্বান্দ্বিকতার দর্শন পেয়েছিলেন সনাতন গ্রীক দর্শন ও উনিশ শতকের জার্মান ভাববাদী স্কুল (German Idealist School) থেকে এবং রাষ্ট্র ও বিপ্লবের ধারণা পেয়েছিলেন ফ্রান্সের বিপ্লবী ইতিহাস থেকে। লেনিন বলেছেন যে এইভাবে মার্ক্স ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রধান তিনটি দেশের আদর্শের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে পরিণতি দান করেছিলেন [Marx 'continued and completed the main ideological currents of the nineteenth century belonging to the three most advanced countries of mankind"—The Teaching of Karl Marx (1914) (Little Lenin Library), p. 17]

প্রান্তলিপি

জর্জ উইলহেলম ফ্রিয়েডরিশ হেগেল (George Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831)—একজন জার্মান দার্শনিক যাঁকে 'চরম ভাববাদী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা' ('founder of the schoolof absolute absolutism') বলে বর্ণনা করে হয়েছে। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। হেগেলের পূর্বে এই অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেছিলেন বিশিষ্ট দার্শনিক ফিক্টে (Fichte)। হেগেল মনে করতেন যে মন বস্তুর আগে জড়ের থেকেও প্রাথমিক ও প্রধান হল চৈতন্য। ইতিহাস মানবমনের মধ্য দিয়ে এক বিশ্বসত্তার অমোঘ প্রকাশ মাত্র। আত্মিক সত্তার অর্থাৎ চৈতন্যের প্রাথমিকতায় এবং মৌলিকতায় শুধু হেগেল নয়, আরও অএনক দার্শনিকই বিশ্বাস করতেন—যেমন বার্কলে, স্পিনোজা, লাইবনিৎস, কান্ট, ফিক্টে, শেলিং, ব্র্যাড্‌লি এবং ক্রোচে ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে হেগেলই একমাত্র দার্শনিক যিনি মার্ক্সকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর দ্বান্দ্বিকতার সূত্রে (Theories of the dialectic) তিনি বলেছিলেন যে প্রগতির প্রসার দ্বন্দ্বের মধ্যে, কোন সরল রেখায় নয় কোন ঋজু পতে নয়। মার্ক্স এই সূত্রের অন্তর্নিহিত ভাববাদকে বাদ দিয়ে এই 'লজিক' গ্রহণ করেছিলেন। যেখানে হেগেল দ্বান্দ্বিকতাকে বিমূর্ত চৈতন্যের প্রক্রিয়া ভেবেছিলেন সেখানে মার্ক্স বস্তুর পরিমণ্ডলে মানবিক অধিষ্ঠানের প্রেক্ষিতে প্রথমে বস্তুর সাথে মানুষের এবং পরে মানুষের সাথে মানুষের উদ্বোধনের প্রক্রিয়া ভেবেছিলেন।

মার্ক্স পুঁজিবাদের প্রসারের মধ্য দিয়ে ইউরোপের সমাজে যে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল তাকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বে (Theory of Surplus value) তিনি শিল্পায়িত সমাজে পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিদের আগ্রাসনশীল কর্মসূচির মধ্যে যে অপ্রতিরোধ্য ঘটনার আবির্ভাব দেখেছিলেন তাকে তিনি তিনটি সূত্রের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। (এক) পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের সূত্র (The Law of Capitalist accumulation) পুঁজিপতিদের মধ্যে উৎপাদনবৃদ্ধির বাজার দখল, শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত শ্রমকে বাজেয়াপ্ত করে তার ফসল ভোগ করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবিরত চলতে থাকে। আর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধনতন্ত্রকে দেয় তার অন্তর্নিহিত গতি। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে প্রত্যেকটি পুঁজিপতির প্রবণতা হচ্ছে তার পুঁজির সঞ্চয় বাড়ানো। কখনো শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে, কখনো অতিরিক্ত উৎপাদন বাজারে মজুত (Dump) করে এবং কখনো কারখানায় শ্রমিক বিতাড়ন করে এবং তার স্থানে মানবিক শ্রম বাঁচানো যায় এ রকম বড় বড় ও আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার চালু করে তারা পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঘনীভবন ঘটায়। তাদের চেষ্টা থাকে ক্রমশ শ্রম-নিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পুঁজি নিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থায় (from labour intensive to capital intensive system of production) উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর দ্বারা পুঁজিপতিরা সংকটে পড়ে। স্থির পুঁজির সঙ্গে চলিত পুঁজির অনুপাত বেড়ে গেলে ('...any increase in the proportion of constant to variable capital is liable to result in a fall in his profits"–R.N. Carew Hunt) পুঁজিপতির লাভ বা মুনাফা কমে যায়। অধিক উৎপাদনের ফলে যোগান বৃদ্ধি পায় পণ্যসামগ্রীর দাম কমে এবং পুঁজিপতিদের উপর আঘাত নেমে আসে। (দুই) পুঁজির ঘনীভবনের সূত্র (The Law of the Cocentration of Capital)—পুঁজির ঘনীভবন ধনতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ নিয়ম। পুঁজিপতিদের মধ্যে সীমাহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল হল এই যে দুর্বল পুঁজিপতিরা প্রতিযোগিতার চাপ সহ্য করতে না পেরে হটে যায়, ক্রমশ তাদের অর্থনৈতিক নিঃস্বতা প্রকট হয়, তারা সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্বল

হতে হতে শেষ পর্যন্ত মজুরি উপার্জনকারীর (Wage-earns) জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। যে পুঁজিপতিরা টিকে থাকে তারা উৎপাদনে, বাজার নিয়ন্ত্রণে এবং শ্রমিক শোষণে নিজেদের আধিপত্য বাড়ায়। তাদের হাতে পুঁজির ঘনীভবন ঘটে। এইভাবে ব্যর্থ পুঁজিপতিদের ক্রমশ অবসান হওয়ার ফলে সফল পুঁজিপতিদের সংখ্যা কমে। তাদের অবস্থান, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব নিরঙ্কুশ হয়, একচেটিয়া কর্তৃত্বের (monopoly) আবির্ভাব ঘটে। মার্ক্স লিখেছেন যে "একজন পুঁজিপতি অনেক পুঁজিপতিকে মারে" ("One Capitalist kills many")। সফল পুঁজিপতিরা তখন ট্রাস্ট (Trust–"combination of produces to do away with competition and keep up prices"), কার্টেল (Cartel–"industrial combination for the purpose of regulating prices, output") ইত্যাদি গঠন করে তাদের পুঁজির বুনিয়াদকে মজবুত করে তাদের লড়বার ক্ষমতা বাড়ায়। (তিন) **ক্রমবর্ধমান দৈন্যর সূত্র** (The Law of Increasing Misery)—ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলি চালু থাকার জন্য শ্রমিকদের দীনতা বৃদ্ধি পায়। নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঁচিয়ে রাখতে পুঁজিপতিরা যতই মরিয়া হয় শ্রমিক শোষণ ততই বাড়তে থাকে। হয় শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্যকে আত্মসাৎ করে, না হয় শ্রমনিবিড় (labour intensive) ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ পুঁজিনিবিড় (Capital intensive) অর্থাৎ যন্ত্রনির্ভর ব্যবস্থায় উপনীত হওয়ার চেষ্টার মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিরা তাদের মুনাফার মাত্রাকে স্থির রাখার বন্দোবস্ত করে। এতে শ্রমিক দীন থেকে দীনতর হয়, সর্বহারা মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে এবং শেষকালে সমাজ একটা পিরামিডের আকার নেয় যেখানে মাথায় থাকে শীর্ষপর্যায়ের দু-একজন সফল বেপরোয়া, নিরঙ্কুশ পুঁজিপতি, আর নীচে থাকে ক্রমশ বিস্ফারিত হাহাকারে তলিয়ে যাওয়া সর্বহারার দল। এরজন্য কোন একজন পুঁজিপতিকে দায়ী করে লাভ নেই। এটি একটি ব্যবস্থা, একটি প্রক্রিয়া, একটি নিরন্তর চলমান অপ্রতিরোধ্য অর্থনীতি, এক নিরঙ্কুশ সমাজব্যবস্থার যান্ত্রিক প্রসারমাত্র।

যেমন অর্থনীতিতে মার্ক্স মূল্যের শ্রমতত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন ইংরাজ অর্থনীতিবদদের কাছ থেকে সেই রকম তিনি জার্মান ধ্রুপদী দার্শনিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর দর্শনের হাতিয়ার তাঁর লজিক— যা দর্শনের ইতিহাসে **দ্বান্দ্বিকতা** বা Dialectic নামে বিখ্যাত।

২.৭ দ্বান্দ্বিকতা কী?

দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিস্তার—এই হল দ্বান্দ্বিকতা (Dialectic)। ভাববাদী জার্মান দার্শনিক হেগেলের কাছে এবং পরবর্তীকালে মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর কাছে দ্বান্দ্বিকতা হল **দুই বিপরীতের মিলনের সূত্র**— ('the theory of the union of opposites')। মার্ক্স তাঁর **ক্যাপিটাল** ও **কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো** (Communist Manifesto) গ্রন্থে, এঙ্গেলস তাঁর **এন্টিডুরিং** (Anti-Duhring) ও **ডায়ালেকটিকস অফ নেচার** (Dialectics of Nature) গ্রন্থে এবং লেনিন তাঁর **নোটস অন হেগেলস্ লজিক** (Notes on Hegel's Logic) গ্রন্থে দ্বান্দ্বিকতার আলোচনা করেছেন।

মার্ক্স হেগেলের দ্বান্দ্বিকতা বা ডায়ালেকটিকের যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা তিনটি সূত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। (এক) **পরিমাণ থেকে বস্তুর গুণগত পরিবর্তন ও তার বিপরীতের সূত্র** (The Law of Transformation of Quantity in Quality and vice versa)—এই নিয়মের দ্বারা পরিমাণের গুণগত

রূপান্তর ও তদ্বিপরীতকে বোঝায়। বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে যায় তবে এক সময় তার গুণগত পরিবর্তনেরও সূচনা হয়। এই পরিবর্তন একমুহূর্তে একটি বিন্দুতে এসে হঠাৎ করে হয়। এই অকস্মাৎ পরিবর্তনের বিন্দুটিকে হেগেল 'নোড' (Node) বলেছেন। জল তাপিত হলে ১০০° সেন্টিগ্রেডে সে হঠাৎ বাষ্প হয় বা তাকে শৈত্যের মধ্যে রাখা হলে ০° সেন্টিগ্রেডে তা হঠাৎ শিলিভূত হয়ে বরফ হয়ে যায়। একটা বিন্দু পর্যন্ত সমস্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও জল জলই থাকে, কিন্তু পরের মুহূর্তে পরের বিন্দুতেই তা বাষ্প বা বরফ হয়। পরিমাণগত পরিবর্তনের এই বিন্দুটি হল নোড (Node)। এর থেকে একটা উল্লম্ফনের সাহায্যে পরিবর্তন ঘটে। এটি হল হেগেলের **উল্লম্ফন তত্ত্ব** (Theory of Leap)। মার্ক্স বলেছেন যে সমাজ জীবনে এই উল্লম্ফনই হল বিপ্লব। যেমন তাপ বা শৈত্যের প্রয়োগে জলের পরিবর্তন হয় সেরকম শক্তিশালী সমাজদর্শন, রাজনৈতিক আদর্শ ও অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা নিয়ে অগ্রসর হওয়া রাজনৈতিক দলের প্রভাবে সমাজে পরিবর্তন আনা যায়।

(দুই) **দুই বিপরীতের মিলন সূত্র** (The Law of the Unity of opposites) এটি একটি বিপরীতের ঐক্যের নিয়ম। এই নিয়ম স্বীকার করে নেয় যে যে-কোন অবস্থানে ঘটমান বা পুরাঘটিত বাস্তব সত্তা ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে একটি প্রকৃতিগত স্ববিরোধিতা রয়েছে। বাস্তবকে বিশ্লেষণ করলে দুটি জিনিস পাওয়া যাবে—একটিকে বলা যেতে পারে **থিসিস** (Thesis)। যা অস্তিত্বশীল, চলমান, একটি প্রত্যক্ষ অবস্থান ও তার বৈপরীত্য। তাকে বলা যেতে পারে **এন্টিথিসিস** (Anti-thesis)। থিসিসের অন্তর্নিহিত সত্য মেলে এন্টিথিসিসের অন্তর্লীন সত্যের সাথে। দুই সত্যের মিলনে জেগে ওঠে এক নতুন কিন্তু পূর্ণ সত্তা যাকে বলা যেতে পারে **সিনথিসিস** (Synthesis)। যেমন বিজ্ঞানে ইলেকট্রনের পরা ও অপরা মেরুর মিলন ঘটে ঠিক সেইভাবে সমাজ-জীবনেও যার অস্তিত্বশীল চলমান এবং তার ভেতরে যা পরিবর্তনকামী বিপরীত তা সমন্বয় ঘটে। মার্ক্স বলতেন যে বুর্জোয়া সমাজেও যেখানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা কায়েম আছে সেখানেও পুঁজিপতিদের সঙ্গে শ্রমিকদের এই বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শ্রম শোষণ না করে বাঁচতে পারে না আর শ্রমিকরাও পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের শ্রম বিক্রয় না করে বাঁচতে পারে না। এইভাবে শিল্পায়িত বুর্জোয়া সমাজে দুই বিপরীত শক্তির সমন্বয় প্রতিনিয়তই ঘটতে থাকে। (তিন) **অপলোপের অবলোপ তত্ত্ব** (The Law of the Negation of the Negation) এই সূত্রের প্রধান কথা হল থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিনথিসিস (বাংলায় বলা হয় প্রস্তাব, বিপ্রস্তাব ও সমন্বয়) হল আসলে বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়, থিসিসের ভেতর থেকে তার স্ববিরোধিতার বৈপরীত্য তাকে বাধা দেয়, থিসিস ভেঙে পড়ে। এন্টিথিসিস প্রবল হয়। থিসিসের পর্যায়কে অবলুপ্ত করে এন্টিথিসিস নতুন পর্যায়ের উদ্বোধন ঘটায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেও মুছে যায় সিনথিসিসের আবির্ভাবে। এইভাবে একটি পর্যায়কে অবলুপ্ত করে আত্মপ্রকাশ করে ইতিহাসের নতুন পর্যায়। কিন্তু বিলীয়মান তার বৈধ উপাদান রেখে যায় উদীয়মানের অন্তঃকরণে যাতে নেতির পরে নেতি, অবলোপের পর অবলোপ ঘটলেও ইতিহাসের যোগসূত্র নষ্ট হয় না। এইভাবে ইতিহাসের ধারা চলে, তার কোন পর্যায়ই চিরন্তন হয় না, জীর্ণতার ভগ্নস্তূপকে সরিয়ে চলতে থাকে অবলোপের অবলোপ, নেতির নেতি। ইতিহাস এইভাবে শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় নিঃসীমভাবে ঋণাত্মক (negative), কিন্তু অফুরন্তভাবে দুই বিপরীতের মিলনে চলমান ধনাত্মক (positive)।

উপরে আমরা যা পড়লাম তা হল বস্তুকেন্দ্রিক মানবজীবনের দ্বান্দ্বিকতা যাকে বলা হয় **দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ**

(Dialectical materialism)। মনে রাখতে হবে যে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস হেগেলের ভাববাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কিন্তু গ্রহণ করেছিলেন তাঁর দ্বান্দ্বিকতা। এই দ্বান্দ্বিকতাকেই তাঁরা জুড়ে দিয়েছিলেন তাঁদের বস্তুবাদের ধারণা যার থেকে জন্ম নিয়েছিল তাদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। মার্ক্স তাঁর **ডাস ক্যাপিটাল** গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় একথা স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি তাঁর নিজস্ব, হেগেলের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হেগেলের মতে কোন চিরায়ত শক্তি এবং চিরন্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যখন মূর্ত হয় তখন তাকে আমরা বাস্তব বলি। বাস্তব জগৎ স্রষ্টার বা বিশ্ব-আত্মার (Idea) বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু মার্ক্সের দ্বান্দ্বিকতা, মার্ক্স লিখেছেন, বিশ্বাস করে যে বস্তুময় বাস্তবতা যখন মানবচৈতন্যে প্রতিফলিত হয় তখনই আত্মার উদ্ভাস ঘটে। বস্তুময় অস্তিত্বেই আত্মা চিন্ময়। মার্ক্স তাঁর এই বস্তুবাদকে ইতিহাসেও ব্যবহার করেছিলেন। তার থেকেই জন্ম নিয়েছিল তংার **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** (Historical Materialism)।

২.৮ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। আসলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে যখন সমাজের মধ্যে কতগুলি মানব-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখনই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের জন্ম হয় [Historical materialism, or the materialistic interpretation of history, is simply dialectical materialism applied to the particular field of human relations within society"—R. N. Carew Hunt] মার্ক্স তাঁর **ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি** (Critique of Political Economy) গ্রন্থের ভূমিকাতে বলেছেন যে, যে নীতি সমাজস্থ মানুষের তাবৎ সম্পর্ককে রূপ দেয় তা নিসৃত হয় একটি লক্ষ্য থেকে যে লক্ষ্যে সমস্ত মানুষ ধাবিত হয়, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণের উৎপাদনই হল সেই লক্ষ্য। এর পরের লক্ষ্য হল উৎপনন দ্রব্যের বিনিময় অর্থাৎ বণ্টন। মার্ক্স এইভাবে ইতিহাসকে নিয়োজিত করলেন মানব সম্পর্কের দুই বস্তুময় লক্ষ্যে। তাহলে জীবন সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য উৎপাদন ('production of the means to support life') ও তদনুবর্তী বণ্টন ('the exchange of things produced')। প্রকৃতি মানুষকে দিয়েছে তার অপার সম্পদ এবং সেই সম্পদকে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম ও ব্যবহারিক দক্ষতা (labour and practical skill)। তা দিয়ে মানুষ তৈরি করে হাতিয়ার, তার শ্রমের দ্বারা নিষ্পন্ন সামগ্রী। মার্ক্সের ভাষায় এ সমস্ত হল **'উৎপাদক শক্তি** ('Productive Forces') অর্থাৎ মানুষের সাথে বস্তুর সম্পর্কই হল উৎপাদক শক্তি। বস্তুর পরিমণ্ডলে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক হল **উৎপাদক সম্পর্ক** ('Productive Relation')। উৎপাদক শক্তির দ্বারা উৎপাদক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়। এইখানেই মার্ক্স তাঁর ইতিহাসতত্ত্বকে বস্তুবাদ ও অর্থনৈতিক উপর দাঁড় করিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে উৎপাদক শক্তিই প্রধান। উৎপাদক শক্তির যখন পরিবর্তন হয় তখনই উৎপাদক সম্পর্কের পরিবর্তন হয়, তার আগে নয়। উৎপাদক শক্তি হল মানব অর্থনীতির বনিয়াদি ঘটনা, তাই অর্থনীতিই হল সমাজ সংগঠনের ভিত—অবতল, মার্ক্সের ভাষায় unterban (substructure), আর বাদবাকি যা আছে আইন, ধর্ম, নৈতিকতা, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য সব হল সমাজ সংগঠনের ঊর্ধ্বতল, মার্ক্সের ভাষায় Oberban (superstructure)। অবতল না বদলালে ঊর্ধ্বতল বদলায় না।